ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার শুভংকরের ফাঁকি

www.rokomari.com

মোহাইমিন পাটোয়ারী

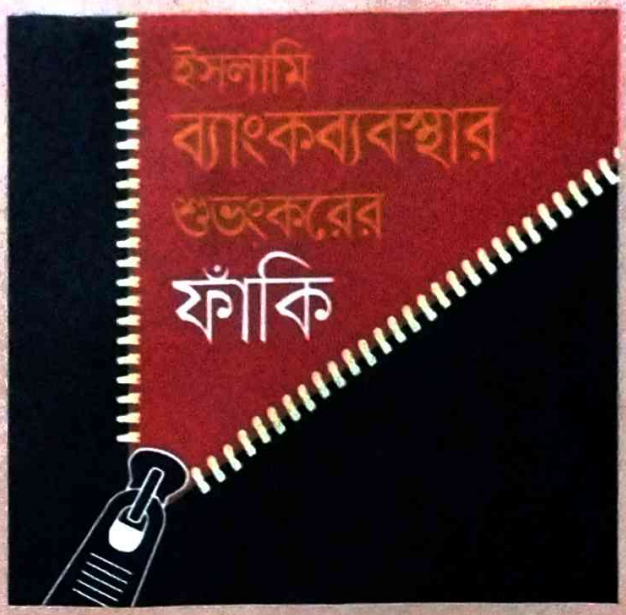

ইসলামি ব্যাংকিং মুসলিম-বিশ্বে নতুন একটি সংযোজন। নতুন-ধারার এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানতে উৎসুক, আবার অনেকেই প্রচণ্ড সন্দিহান। তাই ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে, এর প্রকৃত স্বরূপ, আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থার সাথে এর মিল-অমিল, সীমাবদ্ধতা এবং সমাধান নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার শুভংকরের ফাঁকি
মোহাইমিন পাটোয়ারী

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

তৃতীয় মুদ্রণ
অক্টোবর ২০২৪

প্রকাশকাল
শ্রাবণ ১৪২৯
আগস্ট ২০২২

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
দুইশত বিশ টাকা

ISLAMI BANKBEBOSTHAR SHUBHANGKARER FAKI
by Mohaimin Patwary
Published by Oitijjhya
Date of Publication : August 2022

E-mail: oitijjhya@gmail.com

Copyright©2022 Mohaimin Patwary
All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form

Price: Taka 220.00 US$ 6.00
ISBN 978-984-776-886-1

উৎসর্গ

আমার বাবাকে

যিনি পড়বেন বলে বইটির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করা।

মিনহাজ ভাই

যার দিকনির্দেশনায় লেখক হিসেবে যাত্রা শুরু করা

এবং

বইটই.কম-এর অর্ক

যার অনুপ্রেরণায় এই বইটির কাজ শুরু করা।

ভূমিকা

সময়ের পরিক্রমায় একের পর এক নতুন নতুন কার্যক্রম পৃথিবীতে আসে। ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা তার একটি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বর্তমানে ইসলামি ব্যাংকিং-এর নামে অনেক সন্দেহজনক লেনদেন করা হচ্ছে। অথচ ব্যাংকিং করার জন্য দ্বীনের কিছু অংশ ছেড়ে দেয়া কাম্য হতে পারে না। বরং দ্বীনকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে হলে ক্ষেত্র বিশেষে দুনিয়ার কিছু অংশ ছেড়ে দিতে হবে। তাই হালাল-হারাম মিশ্রিত ইসলামি ব্যাংকিংকে 'নির্দ্বিধায়' গ্রহণ করা ইসলামি দর্শনের পরিপন্থী বলে আমি মনে করি। সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিপরীতে প্রকৃত ইসলামি ফাইন্যান্সিং শরিয়াহ সম্মত পদ্ধতি যথাযথভাবে সমাজে প্রচলন করতে হবে এবং সম্ভাব্য সকল পন্থায় সুদকে পরিত্যাগ করে হালাল পদ্ধতি গ্রহণ এবং ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

যদিও ইসলামি ব্যাংকের প্রচলিত মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি কঠোরভাবে নিয়ম-কানুন অনুসরণ সাপেক্ষে হালাল, তা যে উত্তম পদ্ধতি নয় এ বিষয়ে সকল স্কুল অব থটের ইসলামি চিন্তাবিদ একমত। সমকালীন ইসলামি অর্থনীতিবিদ এবং ইসলামি ব্যাংকিং-এর অন্যতম দিকপাল বিচারপতি মাওলানা তাকি ওসমানী সাহেবের লেখাতেও এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর 'An Introduction to Islamic Finance' বইতে লিখেছেন– "this instrument should be used as a transitory step taken in the process of islamization of the economy, and its use should be restricted to those cases where mudaraba and musharaka are not practicable." তাছাড়া তিনি বেশ কিছু শর্ত উল্লেখ করে বলেন– "If these conditions are neglected, the transaction becomes invalid according to Shari'ah." কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম যেভাবে চলছে তা পর্যালোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে অনেক ইসলামি ব্যাংক পণ্য ক্রয়ের নাম করে কৌশলে গ্রাহকদেরকে সরাসরি অর্থ প্রদান করছে। ফলে সুদি ব্যাংকব্যবস্থার সাথে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য আছে কিনা সেই ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে; বিশেষ করে মুরাবাহা, বায়-মুয়াজ্জাল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে।

সকল মহলে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে যে, বাংলাদেশে যেসব ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকিং করছে, সেগুলো সুদের বিপরীত ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য করছে কিনা? তার অন্যতম প্রধান একটি কারণ হলো উক্ত ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদের অনেকেই সুদি ব্যাংকগুলোর সাথে স্বাচ্ছন্দে লেনদেন চালিয়ে

যাচ্ছে। এর ফলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক যে ইসলামের দর্শন প্রতিষ্ঠা করার তুলনায় পুঁজি বৃদ্ধি করার প্রবণতা ও গুরুত্বই তাদের কাছে অগ্রগণ্য। বর্তমানে সিটি (CITI) ব্যাংক, এইচএসবিসি (HSBC) এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড (Standard Chartard)-এর মালিকপক্ষ অমুসলিম হয়েও ইসলামি ব্যাংকিং করছে! তার কারণও হচ্ছে মূলত পুঁজি বৃদ্ধি।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামি ব্যাংকিং সেক্টর যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাদের একাংশও ইসলামি ফাইন্যান্স সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না। এমনকি ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়নও তাদের লক্ষ্য নয়। নিছক পুঁজিবৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের প্রবেশ। এভাবে গণহারে ইসলামি ব্যাংকিং খাতে পুঁজিপতিদের এসে পুঁজি বৃদ্ধি করা ইসলামি অর্থনীতির মূল চেতনার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়; যেমন সংগতিপূর্ণ নয় বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ বিবেচনায় না নিয়ে গুটিকতেক বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীকে সহজ শর্তে এবং কম মুনাফায় বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের ব্যবসায়ীদেরকে সুবিধা বঞ্চিত করা।

তাই ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার যেসব ত্রুটি বিচ্যুতির দাবি আসছে তা আমলে নেওয়া সময়ের অপরিহার্য দাবি। অন্যথায় সমাজে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে তা নিরসন করা খুব একটা সহজ হবে না।

মোঃ মুখলেছুর রহমান
বিশিষ্ট ইসলামি অর্থনীতিবিদ, ইসলামি ব্যাংকার এবং
বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরিয়াহ বোর্ডের সাবেক সদস্য।

লেখকের কথা

কিছু কাজ আছে যেগুলো করার সময় মনে হয়, "এটি শেষ করা পর্যন্ত যেন বেঁচে থাকি।" আমার জীবনে 'ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার শুভংকরের ফাঁকি' ছিল এমনই একটি কাজ। কারণ, এই বইতে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি উঠে এসেছে যে আলোচনাটা শেষ করার জন্য বেঁচে থাকার বাড়তি প্রেরণা অনুভব করেছি।

এই বইটি আমার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ হবার কারণ হচ্ছে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার সমস্যাগুলোকে নিয়ে এত গভীর বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ আগে কখনো দেখিনি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বইটিতে সমস্যা বিশ্লেষণের পাশাপাশি সমাধান নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে সবার জন্য সুখপাঠ্য করতে বইটির ভাষা খুব সরল রাখা হয়েছে এবং কিছুটা গল্পের আকারে বিষয়াদি বর্ণনা করা হয়েছে।

বইটি লিখতে গিয়ে যেই প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে, "আপনি তো কোনো আলেম না। তাহলে ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে মন্তব্য করছেন কেন?" আসলে ইসলামি ব্যাংকগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন– মুদ্রাব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেম, কল মানি রেট ইত্যাদিও অর্থনৈতিক বস্তু। তাই ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করার জন্য অর্থনৈতিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

পাঠকদের অবশ্য নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই এই ভেবে যে ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞান না রেখেই লেখক বইটি লিখে ফেলেছেন। সুদ, ব্যবসা এবং ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত 'প্রয়োজনীয়' শরিয়া আইন অধ্যয়ন শেষেই বইটি লেখা হয়েছে এবং বইয়ের ভেতরে কুরআন, হাদিস ও আওফির নীতিমালা উল্লেখপূর্বক সব খুলে খুলে বর্ণনা করা হয়েছে।

আরেকটি প্রশ্নের মুখোমুখি আমাকে হতে হয়েছে যে, "শরিয়া বোর্ডের সাথে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন কি?" সত্যি কথা বলতে একটা বা দুইটা নয়, ততোধিক শরিয়া ব্যক্তিত্ব, ইসলামি অর্থনীতিবিদ এবং এই সেক্টরে কর্মরত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করেই বইটি লেখা হয়েছে।

বইটি লেখার কাজে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি মিনহাজ রেজা ও মো. মোখলেসুর রহমান ভাইয়ের। তাদেরকে জানাই ধন্যবাদ। রিদ্মিক ল্যাবের অর্ককেও জানাই ধন্যবাদ। কারণ তার অনুপ্রেরণাতেই নতুন একটি বই লেখার উদ্যোগ নেই। আশা করি বহু পরিশ্রমের বিনিময়ে লিখিত এই বইতে আপনাদের মনের প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে যাবেন এবং সন্দেহের অবসান হবে।

সূচিপত্র

ইতিহাসের আলোকে ব্যাংকব্যবস্থা/ ১৫
ইসলামি ব্যাংকের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান কি মুসলিমদের ইতিহাসে ছিল?/ ১৬
আধুনিক ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা কিভাবে তৈরি হলো?/ ১৮
আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে?/ ২০
ইসলামি ব্যাংকগুলো কিভাবে ঋণ দেয়/ ২১
ইসলামি ব্যাংকগুলোর ব্যবসা কাঠামো বিশ্লেষণ/ ২২
ইসলামের দৃষ্টিতে সুদের সংজ্ঞা কী?/ ২৬
শুভংকরের ফাঁকি/ ২৯
লিজিং ও শিরকাতুল মিল্ক/ ৩০
পলিসি রেট, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সুদ/ ৩৩
নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট/ ৩৫
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য/ ৩৬
শরিয়া বোর্ড/ ৩৭
ডিপোজিট স্কিম/ ৪২
ক্যাপিটাল গেইন/ ৪৫
মুশারাকা ও মুদারাবা/ ৪৬
সুদের সর্বনাশা ফাঁদ/ ৫০
দেউলিয়াত্ব/ ৫৩
ব্যাংকব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য/ ৫৫
ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ/ ৫৭
গভীরে ভাবুন/ ৬০
শেষ প্রশ্ন/ ৬২
সমাধান/ ৬৮
কিছু প্রশ্ন ও উত্তর/ ৭৫
প্রয়োজনীয় শব্দ ও ব্যাখ্যা/ ৮৭

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

১. ইসলামি ব্যাংকের উত্থানকে অনেকেই ইসলামি পুনর্জাগরণের অংশ হিসেবে দেখছে। এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

২. সবকিছুর সমাধান যদি ইসলামে থেকেই থাকে, ব্যাংকব্যবস্থার সমাধান কী?

৩. গোটা বিশ্বের স্কলারদের 'ইজমা' আছে যেখানে, সেখানে আপনি কেন ইসলামি ব্যাংকিংকে শুভংকরের ফাঁকি বলছেন?

৪. ইসলামি ব্যাংকিংকে ১০০ ভাগ হালাল কেউই বলছে না। এর সাথে ৫%-১০% সুদ যে যুক্ত আছে। এই আলোচনা কি সেই পুরনো কাসুন্দিই নতুন করে ঘেঁটেছে?

৫. ইসলামি ব্যাংক প্রায়োগিক দিক থেকে হয়তো অনেক নিয়মই মানছে না। কিন্তু ইসলামি ব্যাংক যেই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে কি কোনো ভুল পরিলক্ষিত হয়?

৬. এমন কোনো পরিবেশ যদি পাওয়া যায় যেখানে ইসলামি ব্যাংকগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তাহলে কি তারা 'শুভংকরের ফাঁকি' থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে?

৭. সুদ ছাড়া কি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? একটি ইসলামি সমাজ ব্যাংক ছাড়া কিভাবে চলবে?

৮. এই বইটি পড়ে সাধারণ মানুষজন কিভাবে উপকৃত হবে?

৯. আপনার কাছে কি কোনো উত্তম সমাধান আছে?

১০. বইটি কি ইসলামের শত্রুদেরকে শক্তিশালী করবে?

১১. এই বইটি লেখার সিদ্ধান্ত আপনি কিভাবে নিলেন? লেখার পেছনে কোন বিষয়গুলো আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছে?

ইতিহাসের আলোকে ব্যাংকব্যবস্থা

ব্যাংকব্যবস্থার ইতিহাস অনেক পুরনো। প্রাচীন ব্যাবিলন, রোম, ভারত ও চীনসহ বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকব্যবস্থা চালু ছিল। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ব্যাবিলনে বর্তমান বিশ্বের ব্যাংকব্যবস্থার মতোই ঋণ লেনদেন ব্যবস্থা চালু ছিল। সেই সময়ের মাটির ফলকগুলো বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছে। প্রায় ৩৭০০ বছর আগে পাথরে খোদাই করা হাম্মুরাবি কোডেও ঋণ আদান প্রদানের নীতিমালার উল্লেখ পাওয়া যায়। আর জুলিয়াস সিজারতো (প্রাচীন রোমের রাজা) ব্যাংকের সপক্ষে আইনই জারি করেন।[৩]

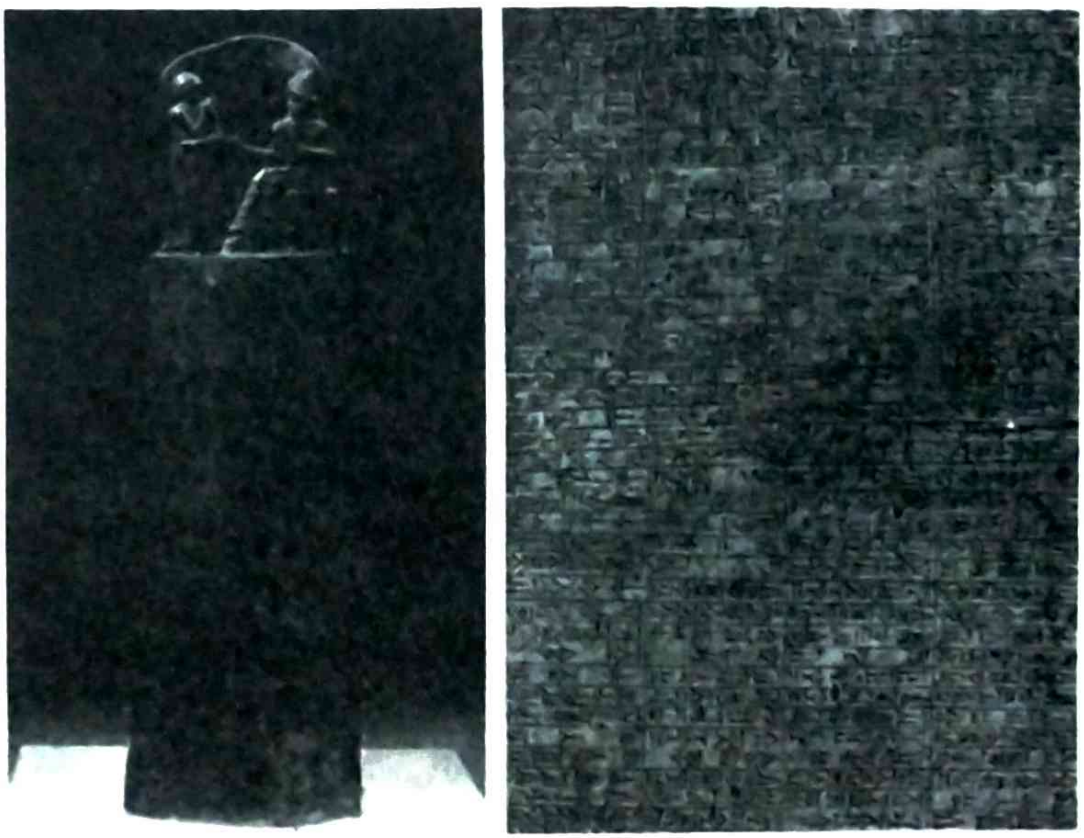

কোড অব হাম্মুরাবি। আজ থেকে প্রায় ৩৭০০ বছর আগে (রাসুল সা.-এর জন্মের প্রায় ২,২৫০ বছর আগে) ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবির সময়ের এই ফলকে সুদ-সমেত টাকা ঋণের নীতিমালার বর্ণনা আছে।

---

৩ ফোর্বস ম্যাগাজিনের অনলাইন প্রতিবেদন লিংক - t.ly/QKT6

তবে প্রাচীন যুগের ব্যাংকগুলো সবদিক থেকে আজকের বিশ্বের ব্যাংকগুলোর মতো ছিল না। আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থা বলতে আমরা যা বুঝি, তার শুরু রেনেসাঁ যুগের ইয়োরোপ থেকে। সেই সময় ইয়োরোপের ইতালি অঞ্চলটি অনেকগুলো ছোট ছোট নগর ও জমিদারিতে বিভক্ত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই নগরগুলোর কিছু সংখ্যক অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এদেরই একটি ফ্লোরেন্সে ১৩৯৭ সালে সর্বপ্রথম আধুনিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতালির বিখ্যাত মেদিচি পরিবারের হাতে গড়া ঐ ব্যাংকটির নাম ছিল 'মেদিচি ব্যাংক'। পরবর্তীকালে তার অনুকরণে ইতালির অন্যান্য সমৃদ্ধ শহরে এবং ধীরে ধীরে সমগ্র ইয়োরোপে ব্যাংকব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলামি ব্যাংকের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান কি মুসলিমদের ইতিহাসে ছিল?

ব্যাংকব্যবস্থা দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে বাগে আনা গেলেও মুসলিম সমাজ ছিল এর প্রভাব থেকে অনেকাংশে মুক্ত। ১৩৯৭ সালেই 'ব্যাংক' সর্বাধুনিক রূপ পায় কিন্তু মুসলিম সমাজ এর আওতাভুক্ত হয় পাঁচশ বছর পরে! সেই সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে মুসলমানরা পিছিয়ে ছিল বলে এমনটি হয়েছে এই ধারণা একেবারেই ভুল। ১৪০০ সাল থেকে ১৭০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তি এবং প্রযুক্তিগত উন্নত রাজ্য ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্য। তাদের দোরগোড়া ইতালিতেই ব্যাংকব্যবস্থা শুরু হয়। কিন্তু এত কাছে থাকা সত্ত্বেও ৪৫৯ বছর তারা ব্যাংকব্যবস্থাকে গ্রহণ করেনি। এই সময় অর্থনৈতিকভাবে মুসলিমরা কোনো অংশেই পিছিয়ে ছিল না, বরং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় আরো সমৃদ্ধ ছিল। কারণ ব্যাংকব্যবস্থা কোনো প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বাক্ষর না। এটি একটি প্রতিষ্ঠান যা হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে চলে এসেছে। ব্যাংক কোনো জাতিকে উন্নত করতে তো পারে নাই, বরং লক্ষ মানুষের নিঃস্ব হওয়ার কাহিনি এর ইতিহাসের সাথে জড়িত আছে।

রাসুলুল্লাহ সা.-এর মক্কা বিজয় (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে শুরু করে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু থাকা ১২৯৫ বছরের ইসলামি খিলাফতের ইতিহাসে মুসলিম সমাজ 'ব্যাংকের' প্রয়োজনীয়তা তেমন একটা অনুভব করেনি। মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম যেই ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার নাম ইস্তানবুল ব্যাংক (১৮৫৬)। ব্রিটিশ, ফরাসি এবং সামান্য পরিমাণে ওসমানিয়ান সরকারের যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাংকটির কার্যক্রম কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। মূলধারার মুসলিম সমাজ এর আওতাভুক্ত ছিল না।

প্রচলিত ব্যাংকিং দ্বারা মূলধারার মুসলিম সমাজকে যখন সুদের আওতাভুক্ত করা সম্ভব হলো না, তখন সুদকেই ইসলামিকরণের চিন্তা শুরু হয়।

গত শতাব্দীর শেষ দিকে হজের টাকা জমানোর প্রয়োজনকে সামনে রেখে 'ইসলামি' ঘরানার সঞ্চয় পদ্ধতি শুরু হয়। ১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ায় 'পিলগ্রিমস সেভিংস করপোরেশন' এই উদ্দেশ্যে সুদমুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে।[৪] এই কর্পোরেশন কিস্তিতে টাকা জমানোর সুযোগ দিত এবং কোনো ধরনের সুদ দিত না। খুব স্বাভাবিকভাবেই ঐ সময়ে অন্য সকল ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের সুদ দিত। তাই 'পিলগ্রিমস সেভিংস করপোরেশনে' টাকা রাখার তুলনায় ঘরে টাকা রাখাই ছিল উত্তম পন্থা। এককথায় এই প্রকল্প বিশেষ কোনো পরিবর্তন বয়ে আনতে পারেনি।

ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রাথমিক কিন্তু শক্তিশালী প্রয়োগ করা হয়েছিল মিশরের 'মিট ঘামর' এলাকায় ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ সালে। ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল প্রেরণা ছিল জার্মান সেভিংস ব্যাংক। জার্মান ব্যাংকের সাফল্য দেখে ড. আহমদ আল নাজ্জার সেই আদলে মিশরের মিট ঘামর এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু মিট ঘামরের মানুষগুলো ছিল ধর্মভীরু মুসলিম। তারা টাকা পয়সা ব্যাংকে জমা রাখত না।

এমতাবস্থায়, এই ব্যাংকের উদ্যোক্তার চ্যালেঞ্জ ছিল ২ টি। মানুষকে টাকা জমানোর মর্ম বুঝানো এবং ইসলামি মূল্যবোধ ধরে রেখে কাজ করা। তাই তিনি মিট ঘামরের ঐ ব্যাংকে ৩ ধরনের অ্যাকাউন্ট চালু করলেন– সেভিংস অ্যাকাউন্ট, ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট ও জাকাত অ্যাকাউন্ট।

---

৪ https://islamicmarkets.com/education/historical-development-tabung-haji

১। যারা টাকা জমা রাখত সেভিংস অ্যাকাউন্টে, তাদেরকে কোনো ধরনের সুদ বা উপকার দেয়া হতো না, কিন্তু তারা যখন চাইত তখন টাকা তুলতে পারত। (তবে তারা ছোট ও স্বল্পমেয়াদি সুদবিহীন ঋণ নিতে পারত ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য।)

২। ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া টাকা তোলার ব্যাপারে একটু কড়া নিয়ম ছিল, চাইলেই তোলা যেত না এবং সেই টাকা শরিয়ার অংশীদারিত্ব ভিত্তিতে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হতো।

৩। জাকাত অ্যাকাউন্টের টাকা শরিয়া নিয়ম অনুযায়ী গরিবদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হতো।

প্রথম চালু করা এরকম ব্যাংক ৪ বছরে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই ব্যাপক সাফল্য পেয়ে যায়। ২৫ হাজার মিশরীয় পাউন্ড থেকে তাদের সেভিংস এই সময়ে বেড়ে ৭৫ হাজারে উন্নীত হয়। আর একই সময়ে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টগুলোয় জমা হওয়া টাকার পরিমাণ ৩৫ হাজার মিশরীয় পাউন্ড থেকে বেড়ে ৭৫ হাজারে উন্নীত হয়। ব্যাংকটার ব্যাপারে এরকম মন্তব্য করা হয় যে তারা অনেক সতর্ক অবস্থায় কাজ করেছিল। ফলে, প্রথম ৩ বছরে ৬০% ঋণের আবেদন নাকচ করে দিয়েছিল।

ড. আহমদ আল নাজ্জারের তৈরি করা এই 'মিট ঘামর ব্যাংক' বিভিন্ন কারণে দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়। তবে প্রকল্পটা ছিল সবার কাছে খুবই আগ্রহের এবং এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

আধুনিক ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা কিভাবে তৈরি হলো?

মিট ঘামরের প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হওয়ার পর ইসলামি ব্যাংক চালু করার ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের আনাচে-কানাচে আলোচনা আসতে থাকে। তবে সেই মডেলকে অনুসরণ না করে এবার আধুনিক ব্যাংকের আদলেই ইসলামি ঘরনার ব্যাংক বানানোর চেষ্টা চলতে থাকে। অর্থাৎ, আধুনিক ইসলামি ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা লাভজনকতায়, ব্যবস্থাপনায়, নীতিমালায় এবং কাঠামোতে প্রচলিত ব্যাংকের মতোই। শুধু ঋণ আদান-প্রদানটা হয় বাহ্যত শরিয়া আইনে।

পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) ও বিশ্বব্যাংকের (World Bank) যৌথ কর্মসূচি "Sturactural Adjustment Programme"-এর

আওতায় বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা চালু করার কাজ আরম্ভ হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালে সৌদি আরবের রাজধানী জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ওআইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি অর্থ সংস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোর সম্মেলনে বাংলাদেশ ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে এবং সেই বছরই জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ওআইসির অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে 'ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক' (আইডিবি) চার্টার গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সরকার 'ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে সেই চার্টারে স্বাক্ষর করে।

১৯৭৫ সালে সৌদি আরবে 'ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক' যাত্রা শুরু করে এবং ঐ বছরই সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'দুবাই ইসলামি ব্যাংক' নামে একটি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীকালে আইডিবি'র হাত ধরেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলামি ব্যাংক দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুয়েত, সেনেগাল, বাহরাইন, পাকিস্তান, ইরান, সুইজারল্যান্ড, আম্মান, জর্দান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস শুরু হয়।

'নাসের সোশ্যাল ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালে মিশরের কায়রোতে। ধরা হয় এটিই প্রথম 'আধুনিক ইসলামি ব্যাংক'।

১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে আইডিবির একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় এসে বেসরকারিভাবে যৌথ উদ্যোগে একটি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে এবং ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নিবন্ধিত হয়।

এই দ্রুত বর্ধনশীল শিল্পকে সংগঠিত করার জন্য, ১৯৯০ সালে অ্যাকাউন্টিং এবং অডিটিং সংস্থা (AAOIFI) খোলা হয়। ১৯৯৬ সালে ইহুদি নিয়ন্ত্রিত সিটি ব্যাংকও ইসলামি ব্যাংকিং বিভাগ চালু করে এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলো শীঘ্রই এই পথ অনুসরণ করে।[৫]

আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে?

আমাদের অনেকের মাঝে এই ভুল ধারণা কাজ করে যে ব্যাংক আমাদের টাকা জমা রাখে। ধারণাটি বেশ ভালোভাবেই ভুল। ব্যাংকে কারো টাকা জমা থাকে না। এটি একটি ঋণ আদান-প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক একজনের থেকে ঋণ নিয়ে অপরজনকে তা দেয়। আমরা যখন ব্যাংকে টাকা রাখি, তখন আমরা মূলত ব্যাংক-কে ঋণ দেই। এজন্যই ব্যাংক আমাদেরকে সুদ দেয়। আবার ব্যাংক থেকে আমরা যখন লোন নেই তখন ব্যাংক আমাদেরকে ঋণ দেয়। এজন্যই আমরা ব্যাংক-কে সুদ প্রদান করি। এই লোন[১] এবং ডিপোজিটের সুদের পার্থক্যই ব্যাংকের লাভ।

আপনি হয়তো ব্যাংকের লকার সেবার নাম শুনেছেন। এই সেবার আওতায় আপনি কোনকিছু একটি নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে ব্যাংকের লকারে জমা রাখতে পারেন। ব্যাংক এই লকারগুলো আলাদা করে তৈরি করে এবং নিরাপদে কোনকিছু সঞ্চিত রাখে। আমরা যদি এখানে টাকা বা স্বর্ণ-গহনা রাখি তাহলে নিরাপত্তার মূল্য হিসেবে আমাদেরকে সার্ভিস চার্জ দিতে হয়। কারণ, লকারে রাখা বস্তু ব্যাংক কাউকে ঋণ দেয় না। এমনকি ব্যাংক যদি দেউলিয়া হয়ে যায় তাহলেও আপনি আপনার জিনিস তুলে আনতে পারবেন। কারণ, আমানতদাতা কোনো ঝুঁকি বহন করে না।

---

৫ সূত্র-https://crescentwealth.com.au/.../history-and-evolution.../

১ ডিপোজিটের তুলনায় লোন অনেক বেশি হয়। এই ব্যাপারে আমরা পরে বিস্তারিত জানবো।

সেই তুলনায় ঋণদাতার হিসেব ভিন্ন। সে ঝুঁকি বহন করে। তাই ব্যাংক যখন দেউলিয়া হয়ে যায়, আপনি ডিপোজিটের টাকা ফেরত পেতে পারেন, নাও পেতে পারেন। তবে ব্যাংক ডিপোজিট সাধারণত সরকার কর্তৃক বীমা করা থাকে। তাই সরকার এই টাকাটা দিয়ে দেয়।[২]

সব মিলিয়ে অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ব্যাংকে টাকা রাখা মানে ব্যাংক-কে ঋণ দেওয়া। এই ধরনের ঋণের বিপরীতে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টের ধরন অনুযায়ী সুদের হার নির্ধারিত হয়। যেমন : ফিক্সড ডিপোজিটে ৫% বা ৭% সুদ, সেভিংস অ্যাকাউন্টে ৪% সুদ এবং কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ০% সুদ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে এই টাকা "কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে" ব্যাংক অন্যদের ঋণ দেয় এবং মোটা অংকের লাভ করে।

ইসলামি ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংক উভয়ই এই কাঠামো অনুসরণ করে, তবে ঋণ আদান-প্রদানের বেলায় তাদের মাঝে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

ইসলামি ব্যাংকগুলো কিভাবে ঋণ দেয়

একটি প্রচলিত ব্যাংক যখন ঋণ দেয় তার আগে সে গ্রাহকের থেকে সব ধরনের কাগজপত্র জমা চায়, যেমন– আয়-রোজকারের হিসেব, ট্যাক্সের বিবরণ, সম্পত্তির হিসেব ইত্যাদি। এই কাগজপত্রগুলো দেখে ব্যাংক গ্রাহকের ঋণ গ্রহণযোগ্যতা যাচাই-বাছাই করে। তারপর, জামানতের (সম্পত্তির) বিপরীতে ঋণ ইস্যু করে। এতটুকুন পর্যন্ত একটি ইসলামি ব্যাংক এবং একটি প্রচলিত ব্যাংকের নীতি একই। ঋণ অনুমোদনের পর যখন টাকা দেওয়ার সময় আসে, একটি প্রচলিত ব্যাংক গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে টাকাটা পাঠিয়ে দেয়, তারপরে সে শর্ত জুড়ে দেয়, "সুদে আসলে এই টাকা দ্বিগুণ করে আমাকে ফেরত দেবেন। আপনাকে পাঁচ বছর সময় দিলাম।"

ঠিক একই উদ্দেশ্যে ইসলামি ব্যাংকগুলোর কাছে আপনি যখন ঋণ নিতে যান, তখন তারা বলবে, "ঋণের টাকায় কী করবেন, জানতে পারি?" আপনি হয়তো বলবেন, "ব্যবসা করব; কিংবা, দোকানে নতুন মাল-পত্র তুলব।

---

২ বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি নিয়ম করেছে, ডিপোজিটকারীদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা ফেরত দেবে। কারো ডিপোজিট ১ লাখ টাকার বেশি হলে বাড়তি কিছুই ফেরত পাবে না।

ইত্যাদি।" ইসলামি ব্যাংকগুলো তখন বলবে, "আপনার ব্যবসা করতে যত প্রকার মাল-পত্র লাগে আমি সব কিনে দিচ্ছি। কিন্তু শর্ত হচ্ছে দ্বিগুণ দামে আমার থেকে কিনতে হবে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে টাকাটা ফেরত দিতে হবে।"

মোদ্দাকথায়, আপনি যখন ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ নিতে প্রচলিত ব্যাংকের কাছে যান, তারা আপনার অ্যাকাউন্টে ৫০ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে পাঁচ বছরে এক কোটি টাকা ফেরত চাইবে (বছরে ২০ লক্ষ টাকা করে) এবং আপনি যখন একটি ইসলামি ব্যাংকের কাছে যান, তারা আপনার কাছে ৫০ লক্ষ টাকার পণ্য ১ কোটি টাকায় বিক্রি করবে। তারপর পাঁচ বছরের মধ্যে ১ কোটি টাকা ফেরত চাইবে (বছরে ২০ লক্ষ টাকা করে)।

সুচিন্তিত পাঠক মনে মনে ভাবতে পারেন, সামান্য কিছু নিয়ম-কানুনের কারসাজি ছাড়া এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

ইসলামি ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, অন্যান্য ব্যাংক যেখানে 'কাঁচা টাকা' ঋণ দিয়ে বাড়তি টাকা ফেরত নিচ্ছে (বা সুদ গ্রহণ করছে) সেখানে ইসলামি ব্যাংকগুলো পণ্য বা সেবা উচ্চমূল্যে বিক্রি করে একই সমান টাকা লাভ হিসেবে ফেরত নিচ্ছে (ব্যবসা করে)। যেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ হারাম এবং ব্যবসা হালাল। তাই ইসলামি ব্যাংক হালাল, কিন্তু বাকি সব ব্যাংক হারাম।

ইসলামি ব্যাংকগুলোর ব্যবসা কাঠামো বিশ্লেষণ

সাদা চোখে ইসলামি ব্যাংকের এই কথাগুলো খুব বাস্তবসম্মত মনে হতে পারে। অথবা মনে হতে পারে ইসলামি ব্যাংকগুলো কোনো শরিয়া আইন ভঙ্গ করে নাই। তাই পৃথিবীর সবগুলো ব্যাংক-কে ইসলামি ব্যাংক বানিয়ে দিলে সুদমুক্ত বিশ্ব নির্মাণ করা সম্ভব। এই ব্যাপারে আমার খুব শক্ত কিছু অভিযোগ আছে।

ইসলামি ব্যাংকগুলোর ব্যবসা কাঠামো বোঝানোর জন্য আমি একটি ছোট গল্পের অবতারণা করি। মনেকরি, নিবিড় একজন তরুণ উদ্যোক্তা। সে চায় একদিন তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান দেশ জুড়ে কাজ করবে এবং অনেক মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ব্যবসা শুরু করার মতো পুঁজি নিবিড়ের নেই। তারপরেও স্বপ্ন পূরণ করতে সে গেল প্রতিবেশী সুফলের

কাছে। সুফল হচ্ছে একজন ধনকুবের যার ব্যাগ ভরা থাকে টাকাতে এবং মন ভরা থাকে লোভে।

নিবিড়ের উদ্যোগের কথা শুনে সুফল খুবই খুশি হল। তবে বিনা লাভে সাহায্য করতে সে রাজি হলো না। এদিকে মুসলিম ধর্মাবলম্বী হওয়ায় টাকা ঋণ দিয়ে বাড়তি ফেরত নিতেও সুফল ভয় পেল। চিন্তা-ভাবনা করতে করতে সুফল একটি বুদ্ধি বের করল।

সুফল নিবিড়ের সাথে ব্যবসা করবে, কিন্তু ব্যবসায় বিনিয়োগ করে লাভ লোকসানের ভাগ সে নেবে না। সুফল চায় সুদের মতো সব সুযোগ-সুবিধা সে ভোগ করবে কিন্তু ব্যবসার মতো ঝুঁকি বহন করবে না। এজন্য সে নিবিড়কে ৫ কোটি টাকা সরাসরি ঋণ না দিয়ে বলল, "তুমি বাজারে গিয়ে নিজের পছন্দমতো ৫ কোটি টাকার যন্ত্রাংশ 'আমার নামে' কিনে নিয়ো। কেনাকাটা শেষে তুমি নিজের কাছে নিজেই ১৫ কোটি টাকা মূল্যে এগুলো বিক্রি করে দিয়ো। এই নাও পাঁচ কোটি টাকা। আগামী দশ বছরের মধ্যে তুমি আমার পাওনা বুঝিয়ে দিয়ো।"

কিছু না বুঝে নিবিড় জিজ্ঞাসা করল, "আমি কি আপনাকে ৫ কোটি টাকা ফেরত দেব? নাকি ১৫ কোটি টাকা?"

সুফল বলল, "অবশ্যই ১৫ কোটি টাকা দেবে। কারণ ৫ কোটি টাকা তো আমার কেনা দাম। এই যন্ত্রাংশ আমি সাথে সাথে তোমার কাছেই ১৫ কোটি টাকা মূল্যে বিক্রি করব। তারপর সেই ১৫ কোটি টাকাই তুমি আমাকে ১০ বছরে ফেরত দেবে।"

নিবিড় অবাক হয়ে চিন্তা করল, "সুফল সাহেব কি কারসাজিটাই না করল। ব্যবসার বাহানা করে সুদের সমান লাভ করে ফেলল!"

পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, নিবিড় কেন ৫ কোটি টাকার যন্ত্রাংশ ১৫ কোটি টাকায় কিনে নেবে? উত্তর হচ্ছে ঋণ নেওয়ার জন্য। বাজারে চলমান সুদের হারে ৫ কোটি টাকা ঋণ নিলে দশ বছর পরে তিন গুণ ফেরত দিতে হয়। তবে সুফল সাহেব যেহেতু এই কাজটা সরাসরি করতে পারছে না, তিনি ৫ কোটি টাকার যন্ত্রাংশ ১৫ কোটি টাকায় বিক্রি করে টাকাটা ফেরত নিলেন। এটাই হলো ইসলামি ব্যাংকের ঋণ প্রদানের সর্বব্যাপী পদ্ধতি।

কেবলমাত্র লাভের দিক দিয়েই যে ইসলামি ব্যাংকগুলো প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মতো তা না। ঝুঁকির দিক দিয়েও ইসলামি ব্যাংকগুলো অন্যান্য ব্যাংকের মতোই। ব্যবসা করে নিবিড় যদি সুবিধা করতে না পারে, তাতে ইসলামি ব্যাংকের কিছু যায় আসে না। নিবিড়কে সব পাওনা বুঝিয়ে দিতে হবে। আবার ঋণ নেয়ার পর যদি নিবিড়ের দোকান আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, তাতেও মোট দায়ের কোনো পরিবর্তন আসবে না। পৈতৃক সম্পত্তি

বিক্রি করে হলেও ১০ বছরে ১৫ কোটি টাকা ফেরত দিতে হবে। কারণ এই চুক্তিতে ব্যাংক কারো ব্যবসা পার্টনার না। সে হচ্ছে অত্যধিক লাভে এবং খুব কম ঝুঁকিতে মাল সরবরাহকারী সওদাগর। যেহেতু সরবরাহকারী ব্যবসার ঝুঁকি বহন করে না, ইসলামি ব্যাংকও ঝুঁকি বহন করবে না।

এভাবে ব্যবসার আড়ালে ইসলামি ব্যাংকগুলো ঋণ আদান প্রদানের কাজ কৌশলে সেরে নেয়। আপনি চাইলে নিজেও তা প্রমাণ করতে পারবেন। আপনি যদি একটি গাড়ি কিনতে কোনো ইসলামি ব্যাংকে ঋণ নিতে যান, ব্যাংক আপনার কাছে গাড়ি বিক্রি করে দেবে। কিন্তু আপনি যদি তাকে জিজ্ঞেস করেন, "ভাই, আপনিতো আমার কাছে গাড়ি বিক্রি করে ফেলেছেন, আপনার 'ট্রেড লাইসেন্স'টা দেখিতো।" উত্তরে ব্যাংক বলবে, "কি যা তা বলছেন! আমিতো 'ব্যাংক'। এখানে গাড়ি বিক্রির লাইসেন্স কোথা থেকে আসবে? আমার কাছে টাকা ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনি আপনার পছন্দ মতন গাড়ি যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে কেনেন। আমি টাকা দেব। তারপর আরো বেশি দামে আপনার কাছে বিক্রির হিসাব দেখিয়ে বাড়তি টাকা ফেরত নিব।" এভাবেই ইসলামি ব্যাংক স্বীকার করবে যে সে কোনো ব্যবসায়ী না। সে ঋণ আদান প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান। তবে জুতা থেকে সুতা পর্যন্ত যা কিছুই কিনতে আপনি সেখানে যান না কেন, ইসলামি ব্যাংক তাই আপনার কাছে বিক্রি করে দেবে।

সাধারণ ব্যাংক

গাড়ি কিনতে চাচ্ছিলাম। ২০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন
তাহলে, গাড়ি কিনে দেই ? প্রতি বছরে ৬ লক্ষ টাকা করে ৫ বছরে মোট ৩০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করে দিয়েন।
আপনার কাছে কি গাড়ি আছে যে বিক্রি করবেন ?
টাকা ছাড়া কিছুই নেই তবে সবই দেখানো সম্ভব !

বিশেষ দ্রষ্টব্য– মুরাবাহা (খরচ + অর্থায়ন), বায়-মুয়াজ্জাল (বাকিতে বিক্রয়) এসব পদ্ধতি সঠিক নিয়ম অনুযায়ী করলে সেটা বৈধ। কিন্তু, ইসলামে ব্যাংকের নব-আবিষ্কৃত পন্থায় কাজগুলো করার মাধ্যমে যদিও সেগুলো কাগজে কলমে বা তাত্ত্বিকভাবে শরিয়া বৈধতায় চলে আসে, পুরো ব্যাপারটা মোটেই ইসলামি অর্থনীতির আদর্শিক কোনো পদ্ধতির মধ্যে পড়ে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে সুদের সংজ্ঞা কী?

খুব সংক্ষেপে, টাকা ঋণ দিয়ে শর্ত সাপেক্ষে অধিক ফেরত নেওয়ার নামই সুদ। আজকে যদি আপনাকে আমি এক গাদা টাকা ধার দিয়ে বলি, "আমাকে একটু বেশি করে ফেরত দিয়ো", এইটা সুদ। তবে সুদ যে কেবল টাকাতেই হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। যেকোনো বস্তু বা সেবাতেই সুদের লেনদেন সম্ভব। আজ যদি আমি আপনাকে একটি রুই মাছ ধার দিয়ে বলি, "আরেকটু বড় সাইজের রুই মাছ ফেরত দিয়ো", এটাও সুদ। তবে ঋণগ্রহীতা যদি নিজ ইচ্ছায় বেশি করে ফেরত দেয়, তা সুদ হিসেবে বিবেচ্য হবে না– বরং উত্তম আচরণ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন আজকে যদি আমি আপনাকে এক বস্তা চাল ধার দেই কিন্তু আপনি আমাকে নিজ ইচ্ছায় দেড় বস্তা চাল খুশি মনে ফেরত দেন সেটা সুদ হবে না। আবার আপনি যদি আমার বিপদের দিনে ১,০০০ টাকা ধার দেন, এবং আমি সুখের দিনে নিজ ইচ্ছায় ১০,০০০ টাকা ফেরত দেই, এটাও সুদ না; এগুলো উত্তম আচরণ। তবে এই জাতীয় লেনদেনে পূর্ব-শর্ত প্রদান করলেই তা সুদ হয়ে যাবে।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে কাউকে ঋণ দিয়ে তার বিনিময়ে শর্ত সাপেক্ষে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিলে, তাও সুদ হিসেবে বিবেচ্য হবে। যেমন– আমি আমার চাচাতো ভাইকে ১ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে বললাম, "সম্পত্তি ভাগাভাগির সময় তুই আমার পক্ষে কথা বলবি।" এটা এক প্রকার সুদ। আবার আমি যদি আমার প্রতিবেশীকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে বলি, "এর বিনিময়ে এলাকাতে কোনো সমস্যা হলে আপনি সবসময় আমার পাশে

থাকবেন।" এটাও সুদ। কারণ উভয় ক্ষেত্রে ঋণের বিপরীতে আমি শর্ত প্রদান করে সুবিধা নিয়েছি। তবে কেউ চাইলে নিজ ইচ্ছায় ভালো আচরণ করতে পারে; তা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

শরিয়তের পরিভাষায় আরেক প্রকার সুদ হচ্ছে বিলম্বের সুদ। কোনো ব্যক্তি যদি ঋণের টাকা ফেরত দিতে দেরি করে, তার বিনিময়ে বাড়তি কিছু নেয়াটা সুদ। এই যেমন আমি একটি দোকান থেকে ১০০ টাকার চাল কিনলাম। চাল কেনার এক মাস পরে টাকাটা দেওয়ার কথা থাকলেও কোনো কারণে আমি তা দিতে পারলাম না। এভাবে আরো দুই মাস যাবার পর আমি যখন টাকাটা দিতে আসলাম, বিক্রেতা দাবি করল, "আপনি যেহেতু দেরি করে টাকা ফেরত দিচ্ছেন, কিছুটা বাড়তি দিতে হবে।" এই যে বাকির টাকা দেরি করে দেওয়ার জরিমানা হিসেবে বিক্রেতা বাড়তি টাকা আদায় করল এটাই হলো বিলম্বের সুদ। আবার মনে করুন, আপনার বন্ধু আপনার থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে উধাও হয়ে গেল। অনেকদিন পর আপনি তার সন্ধান পেলেন। এখন যদি আপনি বিলম্বের কারণে তার থেকে বাড়তি টাকা আদায় করেন, তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে। আবার মনে করুন, আপনি একটি ফ্রিজ কিনলেন ত্রিশ হাজার টাকার চব্বিশটি কিস্তিতে। কিন্তু কেনার পরে কিছু কিস্তি দিতে দেরি হয়ে গেল। দুই বছরে ফ্রিজ কেনার টাকা শোধ করতে পারলেন না। এখন এর বিনিময়ে বাড়তি টাকা আদান প্রদানও শরিয়তের সংজ্ঞানুযায়ী সুদের আওতাভুক্ত হবে।

এবার আলোচনা করা যাক ব্যবসা চুক্তির সুদ নিয়ে। কোনো ব্যবসা চুক্তির অসম লেনদেনের আড়ালে যদি সুদের মতো আদান প্রদান হয়ে থাকে তাও সুদ হিসেবে বিবেচ্য হবে। ধরুন, মিলন আপনাকে এক কেজি কাঁচা খেজুর ধার দিয়ে বলল, "আগামী বছর আমাকে দুই কেজি শুকনা খেজুর ফেরত দিয়ো।" এটাও সুদ।[৬] এই ব্যাপারে হাদিসে উল্লেখ আছে–

> "স্বর্ণের সাথে স্বর্ণের লেনদেন সমান সমান হবে, রুপার সাথে রুপার লেনদেন সমান সমান হবে, খেজুরের সাথে খেজুরের লেনদেন সমান সমান হবে, গমের সাথে গমের লেনদেন সমান সমান হবে, লবণের সাথে লবণের লেনদেন সমান সমান হবে, যবের সাথে যবের লেনদেন সমান সমান হবে। উভয় দিকে সমান সমান লেনদেন না

৬ এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এই মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক না। পরবর্তীকালে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

করে যে কোনো একদিকে বৃদ্ধি করা হলে সেটা রিবা হবে। আর স্বর্ণের সাথে রুপার লেনদেন কম-বেশি করে যেভাবে খুশি সেভাবে করতে পার। তবে নগদে হতে হবে। তেমনি খেজুরের সাথে গমের লেনদেন যেভাবে খুশি কম-বেশি করতে পার। তবে নগদে হতে হবে। তদ্রূপ খেজুরের সাথে যবের লেনদেন যেভাবে খুশি কম-বেশি করে কর। তবে নগদে হতে হবে।"

-ইমাম তিরমিজি, মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরাহ, মৃত-২৭৯ হি., সুনানুত তিরমিজি, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, দ্বিতীয় এডিশন-২০০৮ ইং, হাদিস নং-১২৪০, পৃ.২৯৫।

তবে সকল স্বাভাবিক লেনদেন, যেমন– কাজের বিনিময়ে বেতন, টাকার বিনিময়ে খাদ্য ইত্যাদি ব্যবসা। এই লেনদেনগুলোতে চুক্তিভিত্তিক অসম বণ্টন নিশ্চিত হয় না, যেমনটা আমরা সুদের ক্ষেত্রে দেখে থাকি।**

বিশেষ দ্রষ্টব্য– অনেকে মনে করে কোনো চুক্তিতে সুদের হার নির্দিষ্ট না থাকলে তা সুদ হবে না। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এমন চিন্তার ইসলামি বা জাগতিক কোনো ব্যাখা নেই। আপনি যদি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় সুদের কারবার যেমন লাইবর রেট, ফেড ফান্ড রেট ইত্যাদি দেখেন; খেয়াল করে দেখবেন, তাদের সবগুলোই সময়ের সাথে তারতম্য করছে। অর্থাৎ, রেট তারতম্য করলে যদি কোনো বস্তু সুদ না হতো পৃথিবীতে সুদের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পেতে কষ্ট হয়ে যেত। অর্থাৎ, সুদ ফিক্সড বা তারতম্যশীল উভয়ই হতে পারে।

"যারা সুদ খায়, তারা সেই লোকের মতো দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা বেঁহুশ করে দেয়, এ শাস্তি এজন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় সুদের মতোই', অথচ ব্যবসাকে মহান আল্লাহ্ হালাল করেছেন এবং তিনি সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশবাণী পৌঁছল এবং সে বিরত হলো, পূর্বে যা সুদের আদান-প্রদান হয়ে গেছে, তা তারই, তার মীমাংসা মহান আল্লাহর জিম্মায় এবং যারা আবার আরম্ভ করবে তারাই অগ্নির বাসিন্দা, তারা তাতে চিরকাল থাকবে।"

– সূরা আল বাকারাহ : আয়াত : ২৭৫

** বিভিন্ন প্রকার সুদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে লেখকের অপর বই 'সুদ হারাম কর্জে হাসানা সমাধান' পড়ার আমন্ত্রণ রইল।

শুভংকরের ফাঁকি

প্রচলিত ব্যবসা মুরাবাহা, বায়-মুয়াজ্জাল, লিজিং এবং ইসলামি ব্যাংক কর্তৃক চর্চাকৃত মুরাবাহা, বায়-মুয়াজ্জাল, লিজিং ইত্যাদি এক না। আপনার এলাকার পরিচিত মুদি দোকান থেকে কিছু কেনার পর আপনি যখন দোকানিকে বলেন, "ভাই রে, এই মাসে হাতে কোনো টাকা নেই। তুই সামনের মাসে ভাইয়ের থেকে থেকে টাকাটা নিয়ে নিস।" এটা হচ্ছে বায়-মুয়াজ্জাল (বাকিতে বিক্রয়) লেনদেন। তাহলে ব্যাংক যে গুদাম বা দোকান ছাড়াই সবকিছু বিক্রি করে ফেলছে সেইটা কী? এই ব্যাপারে জানতে চাইলে ইসলামি ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, 'আগের যুগের মুরাবাহা, বায়-মুয়াজ্জাল এবং আধুনিক ব্যাংকিং মুরাবাহা ও বায়-মুয়াজ্জাল এক নয়। আমরা এখন দোকানের মতো পণ্য সাজিয়ে না রেখেও চুক্তিভিত্তিক লেনদেন করে সব ব্যবসা করে ফেলতে পারি।'

দুইটি বস্তু যে এক নয় তা আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি। কিন্তু আধুনিকতার নামে ব্যাংকিং এবং ব্যবসা এক হয়ে যাচ্ছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর জানাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। খেয়াল করে দেখুন, ব্যাংক একজন প্রচলিত ব্যবসায়ীর মতো ঝুঁকি বহন করে না। গাড়ি ব্যবসায়ীর কথাই যদি চিন্তা করেন, তিনি ফ্যাক্টরি থেকে গাড়ি কিনে দোকানে সাজিয়ে রাখেন, ক্রেতার জন্য অপেক্ষা করেন, পণ্য চুরি হওয়ার আশঙ্কা করেন, আগুন লাগার ব্যাপারে ভয়ে ভয়ে থাকেন, আরো কত কী! সেই তুলনায় একটি ব্যাংক মাল বিক্রি নিশ্চিত করেই মাল অর্ডার করে এবং মালিকানা হাতে আসার সাথে সাথে ত্বরিত গতিতে মালিকানা পরিবর্তন করে ফেলে। ঝুঁকি বলতে থাকে কেবল টাকা ফেরত না পাওয়া। কিন্তু অন্য সব ব্যাংকেরই এই ঝুঁকি থাকে।

এবার একটু ভাবুন তো, এত অল্প ঝুঁকিতে এত লাভজনক কোনো ব্যবসা যদি পৃথিবীতে থাকত, সবাই কি এই ব্যবসাই করত না? কিন্তু সবাই কেন তা করছে না? করছে না কারণ এটি কোনো ব্যবসাই না। এখানে কেবল ঋণ আদান প্রদান হচ্ছে। ব্যবসার নাটকটা করা হচ্ছে সুদকে হালাল বানানোর উদ্দেশ্যে। ঋণ দাতা কিংবা ঋণ গ্রহীতা কারোরই ব্যবসা করার নিয়ত নেই। কিন্তু আল্লাহ যেহেতু ব্যবসাকে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম তাই আল্লাহর আইন অনুযায়ী পবিত্র থাকার জন্য ব্যবসার নাটক সাজানো হচ্ছে; এজন্যই একটি প্রচলিত ব্যাংকের মডেলের সাথে আমরা যখন কোনো

ইসলামি ব্যাংকের মডেলের তুলনা করি, সামান্য কিছু প্রক্রিয়াগত তফাত ছাড়া আর কোনো তফাতই নজরে পড়ে না। কিন্তু একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে যখন আমরা ইসলামি ব্যাংকের তুলনা করি, তখন কোনো মিলই খুঁজে পাই না। এই মুহূর্তে অনেকে অভিযোগ করতে পারেন, মুরাবাহা ও বায়-মুয়াজ্জাল ছাড়াও ইসলামি ব্যাংকের আরো কিছু সংখ্যক ব্যবসা মোড আছে। তাই মুরাবাহা যদিও বাহানা হয়। ইসলামি ব্যাংক সম্পূর্ণ বাহানা না। এই প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ করতে চলুন অন্যান্য জনপ্রিয় ফাইনান্সিং মোড সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যাক।

লিজিং ও শিরকাতুল মিল্ক

লিজিং বা ইজারাহ্ এক ধরনের ঋণ প্রদান পদ্ধতি। এখানে ব্যাংক একটি বস্তু ভাড়া দিয়ে সুদের হারের অনুপাতে ভাড়া নেয়। আপাতদৃষ্টিতে এটি ব্যবসা, যেহেতু ব্যাংক আপনার কাছে একটি বস্তু ভাড়া দিচ্ছে এবং তার বিপরীতে ভাড়া তুলছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ব্যাংক যেই বস্তুটি ভাড়া দেয় তার সাথে বাজারের কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভাড়ার হার মিলে না। বরং প্রচলিত ব্যাংকের সুদের হারের সাথে এই ভাড়ার হার পুরোপুরি মিলে যায় এবং একই সাথে উঠানামা করে। এক বাক্যে এটি ভাড়ার নামে ঋণ প্রদান ও সুদ গ্রহণ।

ইসলামি ব্যাংকগুলো বর্তমানে লিজিং থেকে সরে বেশি বেশি শিরকাতুল মিল্কের দিকে যাচ্ছে। তাই হায়ার অ্যান্ড পারচেস আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক বর্তমানে ইসলামি ব্যাংকগুলোর অন্যতম জনপ্রিয় ফাইনান্সিং মোড। এই প্রক্রিয়াটি লিজিং-এর খুব কাছাকাছি। শিরকাতুল মিল্ক পদ্ধতিতে একজন গ্রাহক এবং একটি ব্যাংক যৌথ পুঁজিতে পণ্য (যেমন– জাহাজ) কিনে নেয়। তারপর গ্রাহক কিস্তি দিয়ে ব্যাংকের মালিকানার অংশ কিনে নেয় এবং তার সাথে একটু বাড়তি প্রদান করে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝানো যাক। ধরা যাক, আপনি একটি জাহাজ কিনবেন ১০০ কোটি টাকা দিয়ে। এর জন্য আপনি দিলেন ৫০ কোটি টাকা এবং ব্যাংক দিল ৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, আপনার মালিকানা ৫০% এবং ব্যাংকের মালিকানা ৫০%। এবার আপনি দশ বছরের কিস্তিতে এই মালিকানা কিনে নেবেন। সাথে যত শতাংশ

মালিকানা ব্যাংকের থাকে তার উপর নিয়মিত ভাড়া দেবেন। অর্থাৎ, ১০০ কোটি টাকার একটি জাহাজের ভাড়া যদি বছরে ৮ কোটি টাকা হয়, আপনি প্রতি বছর ব্যাংককে ৪ কোটি টাকা ভাড়া দিলে যার যার মালিকানা ৫০% এ স্থির থাকবে। কিন্তু আপনি যদি প্রথম বছর ১৪ কোটি টাকা কিস্তি দেন তাহলে ৪ কোটি টাকা ভাড়া হিসেবে কাটা যাবে এবং বাকি ১০ কোটি টাকার বিনিময়ে মালিকানা পরিবর্তন হয়ে যাবে। তাই প্রথম বছর শেষে জাহাজের উপর ব্যাংকের থাকবে ৪০% মালিকানা এবং আপনার থাকবে ৬০% মালিকানা। সম্পূর্ণ ইসলাম সম্মত পদ্ধতি। কিন্তু এই পদ্ধতিতেও ব্যাংক বাঁ হাত প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। এখানে সম্পদের ভাড়ার হার প্রচলিত সুদের হারের সাথে মিল করে নির্ধারণ করা হয়। সম্পদ ইন্সুরেন্স করা থাকে দেখে মাল হারানোর ক্ষতিও নেই। আবার ব্যাংকের নামে সম্পদ কোলাটেরাল (বন্ধক) থাকে যেন কোনো কারণে আপনি দেউলিয়া হয়ে গেলে ব্যাংক সম্পদের মালিক হয়ে যায়। এমনকি কিস্তি দিতে না পারলে সুদের পরিমাণও বাড়তে থাকে। সবমিলিয়ে শিরকাতুল মিল্কে প্রচলিত ব্যাংকের ঋণ ও সুদের নিয়ম অনুসারে হয়ে থাকে, এখানে ব্যবসার তেমন কোনো ঘ্রাণ নেই।

টীকা : বাহানা ও হালাল পতিতালয়

হালাল পতিতালয় একটি নতুন ধারণা। ইসলামে বিবাহ হালাল কিন্তু বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক হারাম।[৭] এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে পতিতালয় চালানো যায় তা নিয়ে কিছু উদারমনা আলেমদের সাথে পরামর্শ করে নেদারল্যান্ডসের একটি প্রতিষ্ঠান হালাল পতিতালয় খোলে।

হালাল পতিতালয়ে যেই নারীরা থাকবে তাদেরকে আপনি একটি নির্দিষ্ট মোহর আদায়ের বিনিময়ে বিয়ে করতে পারবেন। বিয়ের কিছুদিন পরে (এক সপ্তাহ থেকে একদিন) আপনি তাদের তালাক দিয়ে চলে যাবেন। আপনার দেওয়া মোহরটাই হবে সেই নারীর পারিশ্রমিক। হালাল পতিতালয়ের নারীদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত

৭ দাসী ব্যতীত।

নামাজের সুব্যবস্থা থাকতে হবে এবং এখানে মদ্যপান করাও নিষিদ্ধ।

হালাল পতিতালয়ে শরিয়ার কোনো আইন সরাসরি ভাঙা হচ্ছে না। কিন্তু তারপরেও আপনি হয়তো একে হালাল বলতে পারছেন না। কেন? তার কারণ হচ্ছে এখানে কেউ বিয়ের উদ্দেশ্যে যায় না। সবাই যায় পতিতা খুঁজতে। আবার এখানের নারীরাও কেউ বিয়ের জন্য আসে না। তারা আসে খদ্দরের থেকে টাকা পাবার আশায়। তাহলে মাঝখানে বিয়েটা হচ্ছে কেন? হচ্ছে বিষয়টিকে হালাল বানানোর জন্য।

হালাল পতিতালয়ের সমর্থকরা বলে, "যেহেতু আল্লাহ বিয়েকে করেছেন হালাল এবং জেনাকে করেছেন হারাম, তাই হালাল পতিতালয় হালাল এবং বাকি সব হারাম।"

অনেকে অভিযোগ করতে পারেন যে এক রাতের জন্যে বিয়ে করার পারিশ্রমিক এবং এক সপ্তাহের জন্য বিয়ে করার পারিশ্রমিক নিশ্চয়ই এক না। তাহলে এইটা বিয়ে হলো কেমনে? এর উত্তরে তারা বলে হালাল পতিতালয়কে কেউ ১০০% হালাল বলছে না। ১০% সমস্যা থাকতেই পারে। তারপরেও এইটাই মন্দের ভালো। বর্তমান বিশ্বে যেহেতু প্রকৃত ইসলামি সমাজ নেই এবং মুসলিম যুবক-যুবতিদেরও বিয়ে হচ্ছে না কিংবা বিয়ের পরে সংসার ভেঙে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আর কিছুই করার নেই! বাধ্য হয়েই ছাড় দিতে হচ্ছে।

রক্ষণশীলরা তারপরেও প্রশ্ন করতে পারে হালাল পতিতালয় ছাড়াই তো উম্মাহ বহু বছর পার করেছে। এটি শুরু না করলে কী ক্ষতি ছিল? এর উত্তরে তাদের কেউ কেউ বলে আপনি বিমানে চড়ে হজে যান কেন? নবি সাহাবিরা কি পায়ে হেঁটে হজে যান নাই? আরেক পক্ষ বলে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেহেতু জেনা প্রবেশ করেছে– চোখের জেনা, মনের জেনা কোনোটা থেকেই আমরা মুক্ত না। বিয়ে করা বর্তমানে আগের তুলনায় অনেক কঠিন। তাই আধুনিক প্রয়োজনকে সামনে রেখে মন্দের ভালো হিসেবে হালাল পতিতালয় খোলা হয়েছে।

একটিবার ভেবে দেখুন তো– আমাদের যেখানে উচিত ছিল জেনার বস্তুকে সমাজ থেকে দূর করে বিয়েকে সহজ করার চেষ্টা করা, সেখানে আমরা জেনাকে ইসলামিকরণ করার চেষ্টা করেছি।

ঠিক একইভাবে আমাদের উচিত ছিল সুদকে সমাজ থেকে দূর করা এবং ব্যবসা, কর্জে হাসানা ও জাকাতের বিস্তার করা। কিন্তু আমরা তার উল্টো পথ বেছে নিয়েছি।

পলিসি রেট, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সুদ

প্রচলিত ব্যাংকের সাথে ইসলামি ব্যাংকের আরেকটি অদ্ভুত মিল হচ্ছে প্রচলিত ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণ ও সুদ মিলে যেই অ্যামাউন্ট আসে, প্রায় একই অ্যামাউন্ট আসে ইসলামি ব্যাংকের ব্যবসা মুনাফায়! আবার যারা ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন, তাদেরকে যে 'শরিয়া-সম্মত' বেনেফিট দেয়া হয় সেটাও হয় প্রচলিত ব্যাংকে আমানতকারীদেরকে দেওয়া সুদের হারের সমতুল্য। এমনকি উভয় ব্যাংকের রেট কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পলিসি রেটের সাথে একত্রে উঠানামা করে। কিন্তু কেন অন্য সকল ব্যবসায়ীর মতো ইসলামি ব্যাংকগুলোর লাভের হার তারতম্য করে না? কিংবা বিদ্যুৎ ও বন্দর তৈরির মেগা প্রজেক্টে বিনিয়োগ করে কেন সে গ্রাহকদের ২০%-৩০% লাভ দিতে পারে না? তার কারণ হলো, ইসলামি ব্যাংক কোনো ব্যবসাই নয়। ইসলামি ব্যাংক যদি ব্যবসা না হয়, আবার কর্জে হাসানাও না হয়, তাহলে এইটা কী? একদম সোজাসাপ্টা বাংলায় এইটা 'ব্যাংক' ছাড়া অন্য কিছুই না।

একজন মানুষকে জুব্বা পরিয়ে দিলেই যেমন সে মুসলিম হয়ে যায় না, কিংবা একটি দেশের সাংস্কৃতিক পোশাক পরিয়ে দিলেই যেমন একজন ব্যক্তি সেই দেশের নাগরিক হয়ে যায় না। তেমনি, শরিয়া হুকুম মতে ব্যবসায়ীর কেনাবেচার সিস্টেম অনুসরণ করলে একটি ব্যাংকও কোনদিন ব্যবসা হয়ে যায় না।

এবার চিন্তা করে দেখুন, সুদি ব্যাংক যদি 'সামান্য' টেকনিক্যাল হেরফের করেই মুসলিমদের কোটি টাকা ব্যাংকে এনে ফেলতে পারে, তাহলে তারা কেন এই 'ইসলামি ভাব' ধরবে না? তাইতো আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের হর্তাকর্তারা এই কাজে এগিয়ে আসেন আর মুসলিম উম্মাহর আর কোনো

উপকার করতে পারুক বা না পারুক, ওআইসি মহীরুহের মতো বড় ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি) গঠন করে ফেলে। খেয়াল করে দেখবেন, জাকাত কিংবা কর্জে হাসানার জন্য এত বড় উদ্যোগ বা কাঠামো গঠনের ব্যাপারে ওআইসি এভাবে এগিয়ে আসে না। এদিকে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের আবেগের কোনো ঘাটতি নেই।

ইসলামি ব্যাংকগুলো হারাম ব্যবসায়, যেমন মদ– জুয়া ইত্যাদিকে ঋণ দেয় না। সুদি ব্যাংকগুলোর সাথে তাদের অন্যতম একটি পার্থক্য এটি। আর ইসলামি ব্যাংকগুলো অন্যান্য সুদি ব্যাংকগুলোর মতো বাংলাদেশ ব্যাংকের ট্রেজারি চালান-বন্ডসহ (সঞ্চয়পত্র) অন্যান্য সুদযুক্ত ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট লেনদেন করে না। এই চেষ্টাগুলোর জন্য তারা প্রচুর প্রশংসা পাচ্ছে, সাথে সাথে যেসব জায়গায় তারা হেরে গিয়েছে সুদের কাছে, সেটার জন্য তারা আদতে কখনোই মুসলিম বিশ্বের আস্থার জায়গায় আসতে পারেনি।

এবার মোক্ষম প্রশ্নটা করি, 'ইসলামি ব্যাংকের কি সরাসরি কোন সুদি লেনদেন আছে?'

১। কোন ব্যাংকের মূলধনের ২০% হাতে রেখে দিতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের আইন অনুযায়ী, ৫% ক্যাশ আর ১৫% ট্রেজারি অনুমোদিত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করতে হয়। এই বিনিয়োগের বিপরীতে ইসলামি ব্যাংকগুলো 'সুদ' গ্রহণ করে। এই সুদ তারা 'সদকা' করে দেয়, কিন্তু এটা কি তাদেরকে 'সুদ গ্রহণকারী' প্রমাণ করে না?

২। ইসলামি ব্যাংকগুলো সরকারকে যখন ঋণ দেয়, তখন কি এই সরকারকে শর্ত দিতে পারে যে সরকার কোন খাতে এই টাকা খরচ করতে পারবে বা কোন খাতে পারবে না? সরকার সবার সাথে 'একইভাবে' ডিল করে, সুতরাং ইসলামি ব্যাংক থেকে 'নির্ধারিত সুদ হার' অনুযায়ীই সরকার টাকা ঋণ নেয় ও 'সুদ-সমেত' ফেরত দেয়।

৩। ঋণ নিয়ে কেউ যদি দেরি করে টাকা ফেরত দেয় তার জন্য বাড়তি গ্রহণ করা প্রকাশ্য সুদ। এই ব্যাপারে কোনো ইখতিলাফ নেই। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকগুলোর থেকে কেউ ঋণ নিয়ে টাকা ফেরত দিতে দেরি করলে ব্যাংক জরিমানা নেয়। বর্তমানে কেবল এককালীন জরিমানা না, বরং সরাসরি সুদ নেয়। তাদের সফটওয়ারগুলো সুদের হারের মতো প্রোগ্রাম করে। এই সুদ অবশ্য CSR কাজে ব্যয় করা হয়। কিন্তু CSR এক প্রকার কোম্পানির প্রচারণা ব্যয়। নিয়ম হচ্ছে সুদের টাকা দান করলে নিঃস্বার্থভাবে দান করতে হবে। কিন্তু ব্যাংক তার নিজের নামে ফান্ড খুলে সেই ফান্ডে সুদের টাকা দান করলে নিঃস্বার্থ হলো কি?

বিশেষ দ্রষ্টব্য– বাংলাদেশ ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড এককালে জরিমানা নিত না। কিন্তু অনেক গ্রাহকই ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করে টাকা ফেরত দেয় এবং ব্যাংক এর ফলে বেকায়দায় পড়ে যায়। তখন বাংলাদেশ ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড দেরি করা ঋণ পরিশোধ করার সাথে জরিমানা যুক্ত করে। এর পর থেকে তারা দুর্দিন কাটিয়ে ভালো দিন দেখতে পায়। এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি গ্রাহক পর্যায়ে দুর্নীতি দূর করতে না পারলে ব্যাংকগুলোর থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না। আমাদের নিজেদেরকেও দায় নিতে হবে।

নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট

ইসলামি ব্যাংকগুলো যখন এলসি খুলে, এর বিপরীতে বিদেশি ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ডলার ডিপোজিট দেখাতে হয়। সাধারণত আমেরিকার বড় ব্যাংকগুলোতে এই অ্যাকাউন্টগুলো খোলা হয় (যেমন– জেপি মরগ্যান)। এই অ্যাকাউন্টগুলোকে ইংরেজিতে নস্ট্রো (NOSTRO) অ্যাকাউন্ট বলে। সাধারণত দেশি ব্যাংক এবং বিদেশি ব্যাংক উভয়েরই নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট থাকে। নস্ট্রো (NOSTRO) অ্যাকাউন্টে যেই ব্যাংকের ডলার ডিপোজিট যত বেশি, সেই ব্যাংকের গ্রহণযোগ্যতা তত বেশি। তাই ইসলামি ব্যাংকগুলোও নস্ট্রো অ্যাকাউন্টে বড় অ্যামাউন্টের ডলার রাখে।

স্বভাবতই নস্ট্রো অ্যাকাউন্টে নিয়মিত সুদ আসে। কারণ বিদেশি ব্যাংকগুলো ১০০% সুদি। সেই হিসেবে বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে সুদের সাথে হাত মেলাতেই হয়। আমি দাবি করছি না আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ করে দিতে হবে। বাধ্য হয়ে নস্ট্রো অ্যাকাউন্টে লেনদেন করা যেতে পারে আপাতত। কিন্তু সমস্যাগুলোকে গ্রাহকদের কাছে খুলে বর্ণনা করতে হবে। কোনো পণ্যে সমস্যা থাকলে এই ব্যাপারে নীরব থাকা এক প্রকার মিথ্যাচার। তাই এই ব্যাপারটা কোনভাবে গোপন রাখা যাবে না। দ্বিতীয়ত, পলিসি লেভেলে এই ব্যাপারে সমাধানের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করতে হবে। সম্পূর্ণ সিস্টেমে আরাম করে জেঁকে বসে হাজার হাজার কোটি

টাকার ব্যবসা করে নিজেকে মজলুম বললে হবে না। তৃতীয়ত, সুদের টাকা একেবারে গোপনে এবং নিঃশর্তভাবে দান করে দিতে হবে। এর থেকে কোনপ্রকার জাগতিক সুবিধা নেওয়া যাবে না। চতুর্থত, বিশ্বের সকল ইসলামি ব্যাংককে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে যেন মুসলিম দেশগুলো সুদমুক্ত উপায়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করতে পারে। পঞ্চমত, ইসলামি ব্যাংক সুদমুক্ত বা ব্যবসার মতো পবিত্র এমন ধ্যান, ধারণা ও শ্লোগান এই মুহূর্তে পরিত্যাগ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করার জন্য একজন আমদানিকারককে এলসি খুলতে হয়। এই এলসিতে যিনি পণ্য আমদানি করেন তার নাম এবং তার ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকে। এলসি ডকুমেন্টে মাল আমদানি করা হয় গ্রাহকের নামে। কিন্তু ব্যাংক গ্রাহকের কাছেই এই মাল বিক্রি করে দেয়। আরেক জনের নামে ইস্যু হওয়া মাল ব্যাংক কিভাবে আবার তার কাছে বিক্রি করে? একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝানো যাক। মনে করি, দাস্তগির সাহেব চীন থেকে সুতা আমদানি করতে একটি এলসি খুললেন। তাহলে, দাস্তগির সাহেবের নামেই সুতা আসবে।

ধরি, দাস্তগির সাহেবের সুতার দাম ১ কোটি টাকা। এই সুতা কেনার জন্য তিনি খাস্তগির ব্যাংক-কে ১ কোটি টাকা দেবেন। এদিকে চীনা উৎপাদনকারীর ব্যাংকের নাম 'জুং গুয়ো' ব্যাংক। তাই তিনি লেনদেন সম্পন্ন হবার দলিল 'জুং গুয়ো' ব্যাংকে জমা দেবেন। তখন খাস্তগির ব্যাংক 'জুং গুয়ো' ব্যাংককে ১ কোটি টাকার সমপরিমাণ ডলার ট্রান্সফার করে দেবে এবং 'জুং গুয়ো' ব্যাংক সুতা বিক্রেতাকে ১ কোটি টাকার সমপরিমাণ চীনা মুদ্রা দিয়ে দেবে।

এলসি প্রসেস বুঝা গেলে একবার চিন্তা করে দেখুন, ইসলামি ব্যাংক কিভাবে গ্রাহকের কাছেই অধিক লাভে পণ্য বিক্রি করতে পারবে? পণ্য তো গ্রাহকের নামে ইস্যু করা। এর সমাধান স্বরূপ ইসলামি ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের বলে, "তুমি এই পণ্যের কাফালাহ (যে ব্যক্তি কর্তৃত্ব বা গ্যারান্টি প্রদান করে) হও। অর্থাৎ, বিদেশ থেকে চট্টগ্রাম পোর্ট পর্যন্ত তুমি এই পণ্যটি আনার গ্যারান্টি দেবে। তারপর আমি তোমার থেকে পণ্যটি কিনে নেব। তারপর

তুমি পোর্টে মাল খালাস করে দেবে। তখন তোমার কাছেই সুদের হারের সমপরিমাণ লাভে তা বিক্রি করে দেব। এভাবে আমরা সুদকে হালাল মুনাফায় রূপান্তর করে ফেলব।"

এবার ভাবুন তো এমনটা করলে কাগজ কলম বাদে একটি সুদি ব্যাংকের সাথে একটি ইসলামি ব্যাংকের পার্থক্য কোথায়?

শরিয়া বোর্ড

বাস্তবে ইসলামি ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তা, শরিয়া বোর্ডের ব্যক্তিবর্গ এবং নির্বাহী প্রধানদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাদের কেউ কেউ এমন কিছু যুক্তি প্রদান করেন যা সত্যই বিভ্রান্তিকর। এমনই একটি যুক্তি হচ্ছে, "আপনি কিন্তু মরা মুরগিই খান। আল্লাহর নামে জবাই করে খান দেখে তা হয়ে যায় হালাল। সেই হিসেবে ইসলামি ব্যাংকও অন্য ব্যাংকের মতোই, কিন্তু বিশেষ কায়দায় কাজটি করে বলে সে হয়ে যায় হালাল।"

এমন আরেকটি যুক্তি হচ্ছে, "আপনি যদি কোনো নারীকে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে বলেন এর বিনিময়ে আমার সাথে এক রাত কাটাও–সেটা হারাম। কিন্তু আপনি যদি সেই একই নারীকে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে তিনবার কবুল পড়িয়ে রাত কাটান তা হয়ে যায় হালাল। অর্থাৎ, ঘুরিয়ে খাওয়াটাই ইসলাম। সেই হিসেবে ইসলামি ব্যাংক সব দিক থেকেই হালাল।"

এই ধরনের কথাবার্তায় অনেকে বিভ্রান্ত হয় দেখে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি। প্রথমত, কায়দা করেই সবকিছু হালাল করা যায় না যদি সেখানে বাহানা থাকে। এই ব্যাপারে আল্লাহর সরাসরি নির্দেশনা থাকতে হয়।

মনে করুন, একটি হারাম প্রাণীকে আপনি আল্লাহর নামে জবাই করলেন। তাহলে কি তা হালাল হয়ে যাবে? না, তা হবে না। কিন্তু কেন হবে না? তার কারণ, আল্লাহ বলেছেন হারাম প্রাণী যেমন শূকর হারাম। কিন্তু তিনি কোথাও এমনটি বলেননি যে বিশেষ কায়দা অনুসরণ করলে শূকরও হালাল হয়ে যাবে। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন সুদ হারাম। কিন্তু 'কোন কায়দায় তাকে হালাল বানানো যায়' তার সরাসরি কোন উল্লেখ কুরআনে নেই।

আবার আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যৌন সঙ্গম করা হারাম, কিন্তু তোমরা যদি দেনমোহর দিয়ে বিয়ে কর[৮] তাহলে তা হালাল হবে। কত স্পষ্ট বিধান ইসলামের। এখানে নাই কোনো বক্রতা, নাই কোনো জটিলতা বা বাহানা।

জবাই এবং বিয়ের কথা আল্লাহ নিজে কুরআনে বলে দিয়েছেন। তার সাথে ১৯৭০-এর দশকে আবিষ্কৃত একটি মানব-সৃষ্ট পদ্ধতিকে কিভাবে আমরা তুলনা করতে পারি?

আপনি যদি ভেবে থাকেন এখানে ইসলামি ব্যাংক যেহেতু টেকনিক্যালি কোনো আইন ভঙ্গ করে নাই, এটি হালাল হবে, তাহলে কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে আলোচনা করা যাক।

> "তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার সম্পর্কে সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাদের বলেছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানর হও।'" *(সূরা বাকারা, আয়াত - ৬৫)*

এরা কারা যাদেরকে আল্লাহ বানর বানিয়ে দিয়েছেন? অপর একটি আয়াতে আল্লাহ এদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন :

> "তাদেরকে সমুদ্রতীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তারা শনিবারের সীমালংঘন করত; শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসত। কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদযাপন করত না সেদিন তারা (মাছ) তাদের নিকট আসত না। এইভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম, যে কারণে তারা সত্য ত্যাগ করত।" *(সূরা আরাফ, আয়াত - ১৬৩)*

সম্পূর্ণ ঘটনাটি এমন। ইহুদিদের জন্য শনিবার মাছ ধরা জায়েজ ছিল না। এই দিন মাছেরা ভেসে ভেসে সমুদ্রের একেবারে কিনারায় চলে আসত। তবে কিছু ইহুদি চাইল আল্লাহর আইন ভঙ্গ না করেই মাছ ধরবে। তাই তারা শনিবার মাছ না ধরে বাঁধ দিয়ে মাছগুলোকে আটকে রাখত এবং পরের দিন সুন্দর করে সেগুলোকে ধরত। কাগজে কলমে তারা আল্লাহর কোনো আইন ভঙ্গ করেনি। খুব কৌশলে কার্যোদ্ধার করে ফেলেছে। তারপরেও আল্লাহ তাদের উপর শাস্তি আরোপ করলেন এবং বানর বানিয়ে দিলেন। এবার একটি হাদিস শুনুন–

---

৮ অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের সাথে।

উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদি জাতিকে ধ্বংস করুন; (হালাল জীবেরও) চর্বি (বিক্রি করা) তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু তারা ঐরূপ জাতীয় চর্বি গলিয়ে (তেল হিসেবে) তা বিক্রি করেছে। *(বুখারি ২০৭১, মুসলিম)*

দেখুন, এক্ষেত্রেও ইহুদি জাতি আল্লাহর কোনো আইন টেকনিক্যালি ভঙ্গ করে নাই। তাহলে আল্লাহ কেন তাদের শাস্তি দিলেন? আমি যেই কথাগুলো বলছি তা মোটেও নতুন কিছু না। ইসলামি শরিয়ার পরিভাষায় এই ধরনের কাজগুলোকে বলে হীলা (বাংলায় বাহানা)। এই ব্যাপারে সকল আলেম একমত হয়েছেন যে, "যখন কোনো বাহানায় কারো হক বাতিল করা হয় অথবা কোনো বাতিল জিনিসকে এমনভাবে রংচং করে উপস্থাপন করা হয় যা মানুষকে তার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অজ্ঞ করে রাখে ইসলামের দৃষ্টিতে তা নিষিদ্ধ।"

আওফির (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) m.25., av.6/3/3 অনুযায়ীও যে সকল বাহানা শরিয়ার উত্তম কোনো উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে করা হয় সেগুলো বৈধ নয়। কিন্তু ইসলাম পরিপন্থী কোনো কার্য সাধনের উদ্দেশ্যে এমন কাজ করা হলে তা অবৈধ। তাহলে সরাসরি সুদ খাওয়া যাচ্ছে না দেখে ব্যবসার বাহানা করা কি বৈধ নাকি অবৈধ?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনেও শরিয়া বোর্ডে অনেকে না বুঝার ভান করে আছেন। অনেকে মন্দের ভালো হিসেবে ইসলামি ব্যাংকে বসে আছেন। আবার কেউ কেউ বুঝে-শুনে স্বেছায় অবসরে চলে যাচ্ছেন। শরিয়া বোর্ড থেকে অবসর নেওয়ার ব্যক্তির সংখ্যা অনেক বেশি। এমনকি সর্বোচ্চ পর্যায়েও তা বিদ্যমান। আমি এমনই একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছি যিনি ইসলামি ব্যাংকগুলোর শরিয়া বোর্ডে সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি ইসলামি ব্যাংক থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন। এই ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "যখন থেকে বুঝতে পারলাম ইসলামি ব্যাংকিং সম্পূর্ণ সুদ এবং ধোঁকা, তখন থেকেই আমি এই খাত থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেই। আলহামদুলিল্লাহ, এখন আমি কোনো প্রকার ইসলামি

ব্যাংকের সাথে জড়িত নেই।" যিনি দীর্ঘদিন শরিয়া বোর্ডে দায়িত্বরত ছিলেন, তার থেকে এই ধরনের উক্তি পাওয়া কতটা ভয়ংকর![৯]

এই মুহূর্তে আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইসলামি ব্যাংকগুলো কি এভাবেই চলছে? তাদের অবস্থাও কি এমন? এর উত্তর হচ্ছে তাদের অবস্থাও এমন। তারাও "ব্যাংক মুরাবাহা, ব্যাংক বায়-মুয়াজ্জাল, শিরকাতুল মিল্ক" ইত্যাদি অত্যন্ত লাভজনক পদ্ধতির অনুসরণ করছে। তবে অতি সামান্য সংখ্যক ব্যাংক আছে যারা লাভ লোকসানের অংশীদার হয়ে (মুশাকারা পদ্ধতিতে) ব্যবসা করে কাজ চালানোর চেষ্টা করছে। তবে বড় ব্যাংকের ক্ষেত্রে সেই সংখ্যাটাও অনেক ক্ষেত্রে কমে আসছে। কারণ সুদের মতো চুক্তিগুলোই বেশি লাভজনক।

বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে শাহজালাল ইসলামি ব্যাংকের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন,

> "ইসলামি ব্যাংককে যদি ইসলামি করতে হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আন্ডারে শরিয়া বোর্ড রাখতে হবে। কারণ বর্তমানে শরিয়া বোর্ড থাকে এমডির নিয়ন্ত্রণে। এমডির কাছেই শরিয়া বোর্ডকে রিপোর্ট করতে হয়। এখানে একটি কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট কাজ করে। কারণ এমডির লক্ষ্য থাকে প্রফিট মাক্সিমাইজ করা। শরিয়া বোর্ডের কোনো সিদ্ধান্তে যদি ব্যবসা লাভের জন্য ক্ষতিকর হয়, সেই ক্ষেত্রে শরিয়া বোর্ড কার্যত স্বাধীন থাকতে পারে না। সব মিলিয়ে বিষয়টি হয়ে যায় একনায়ক সরকারের ছায়াতলে নির্বাচন করার মতো। তাই সত্যিকারের ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আন্ডারে শরিয়া বোর্ড থাকা উচিত।"

একই ধরনের হতাশা প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় শরিয়া বোর্ডের সাবেক সেক্রেটারি এবং প্রায় ১২টি ব্যাংকের শরিয়া বোর্ডের সাবেক সদস্য মো. মুখলেছুর রহমান। তিনি বলেন,

---

৯ সাক্ষাৎকারটি ২০২১ সালে নেওয়া হয়েছে।

"বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ইসলামি ব্যাংকগুলোর জন্য কোনো শরিয়া নীতিমালা নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ইসলামি ব্যাংকগুলোর জন্য একটি গাইডলাইন প্রদান করা হয়েছে যা কতগুলো ব্যাংক কত শতাংশ অনুসরণ করছে তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকাও এক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ। আওফি (AAOFI) স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী শরিয়া বোর্ডের সদস্যদের এজিএম থেকে নিয়োগ দিতে হবে এবং প্রভাবশালী কোনো শেয়ার হোল্ডার এবং নির্বাহী কর্মকর্তা ও কর্মচারী শরিয়া বোর্ডের সদস্য হতে পারবে না। সেই হিসেবে ব্যাংকের ডিরেক্টর পদে আসীন কোনো ব্যক্তি বা ব্যাংকে কর্মরত জনশক্তি শরিয়া বোর্ডের সদস্য হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাংকের শরিয়া বোর্ডে পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যাংকের কর্মকর্তাও শরিয়া বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এমনকি একটি ইসলামি ব্যাংকের চেয়ারম্যানও উক্ত ব্যাংকের শরিয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বলে আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে।"

তাদের ভাষ্যমতে স্বাধীন শরিয়া বোর্ড বলতে বাস্তবে কিছুই নেই। কারণ, শরিয়া বোর্ড খোলা হয় মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য। তাই জনপ্রিয় আলেম, টিভি ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় বক্তা প্রমুখ আসেন বোর্ডে। যদি শরিয়া চর্চা করার জন্য শরিয়া বোর্ড খোলা হতো, তাহলে সত্যিকারে আল্লাহ ভীরু, ব্যাংকিং সেক্টর সম্পর্কে জ্ঞানী এবং আপসহীন ব্যক্তিদের এখানে আনা হতো।

এই ব্যাপারে কাজ করতে গিয়ে আমি নিজেও বক্তব্যের সত্যতা পেয়েছি। আমাদের সাথে একটি ওয়েবমিনার জনপ্রিয় বক্তা শায়েখ আহমাদুল্লাহ নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি ব্যাংকিং সেক্টর সম্পর্কে বুঝেন না। কিন্তু তারপরেও তিনি একসময় একাধিক ব্যাংকের শরিয়া বোর্ডে ছিলেন (পূর্ণাঙ্গ লাইভ ভিডিওটির লিংক ফুটনোটে)[১০]। আলহামদুলিল্লাহ, তিনি ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং এই কারণে সকল ব্যাংকের শরিয়া বোর্ড থেকে সরে এসেছেন। কিন্তু বর্তমানে যারা শরিয়া বোর্ডে জেঁকে বসেছেন তারা কি ব্যাংকিং সেক্টর বুঝেন? যদি না বুঝে থাকেন, মানুষের আস্থা জোগাড় করা ব্যতীত এই বোর্ডের কাজ কী?

---

১০ ttps://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=884736879054460

ডিপোজিট স্কিম

ইসলামি ব্যাংক যখন গ্রাহকদের থেকে ডিপোজিট গ্রহণ করে তখন তারা তা কী করে? একটি বিষয় আপনারা ইতোমধ্যেই জেনেছেন যে ডিপোজিট এক প্রকার ঋণ। ইসলামি ব্যাংক যেহেতু কাগজে কলমে কোনো ঋণ নেয় না, তারা এই টাকা মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। এই মুদারাবা পদ্ধতিটা কী তা ব্যাখ্যা করা যাক।

মুদারাবা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে টাকা প্রদানকারী ব্যবসার মালিক (ইনভেস্টর) বনে যান এবং টাকা গ্রহণকারী ম্যানেজার হিসেবে থাকেন। এটি সম্পূর্ণ হালাল পদ্ধতি। মনে করুন, আপনার হাতে ১ কোটি টাকা আছে। এই টাকায় আপনি একটি দোকান কিনলেন। এখন আপনি হচ্ছেন দোকানের মালিক। কিন্তু দোকান চালানোর সামর্থ্য আপনার নেই। আমি 'পাটোয়ারী সাহেব' হচ্ছি একজন ম্যানেজার। আপনি আমাকে খুঁজে-পেতে বের করে বললেন, "নিজের মতো করে আমার ব্যবসা দেখেন। এর থেকে যা লাভ হয় তার তিন ভাগের এক ভাগ নিজে নেবেন এবং দুই ভাগ আমাকে দেবেন। যেহেতু আপনার কোনো পুঁজি নেই লোকসানের ভাগ আপনি নেবেন না। ব্যবসা লস করলে তার পুরাটাই আমার।"

এই ধরনের চুক্তির নামই মুদারাবা। তারমানে মুদারাবা চুক্তিতে ইসলামি ব্যাংকগুলো যখন আমাদের থেকে টাকা ডিপোজিট নিচ্ছে তখন আমরা হয়ে যাচ্ছি ব্যাংকের মালিক (আরবিতে সাহিব-আল-মাল) এবং ব্যাংকের কর্মচারীরা হয়ে যাচ্ছে আমাদের ম্যানেজার (আরবিতে মুদারিব)। প্রতি বছর যেই পরিমাণ লাভ হয় সেখান থেকে ব্যাংক একটি অংশ পারিশ্রমিক হিসেবে রাখবে এবং বাকি সব আমরা পাব। আবার ব্যাংক লোকসান করলে তার পুরোটাই আমরা বহন করব।

কিন্তু বাস্তবে কি তা মানা হচ্ছে? ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায় না, কোনো ইসলামি ব্যাংকে টাকা রেখে সাহিব-আল-মাল লোকসানের শরিক হয়েছে (যদিনা ব্যাংক নিজেই দেউলিয়া হয়ে যায়)। বরং অর্থ যোগান দাতার লাভের হার সুদের বাজার দরের সাথে মিল রেখে হাতে হাত ধরে চলে।

আরেকটি দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে ইসলামি ব্যাংকগুলোর বোর্ড অফ ডিরেক্টরে ডিপোজিটরদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। ব্যবসা বিনিয়োগকারী হিসেবে তাদের বোর্ডে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে বোর্ডে

অংশগ্রহণ তো দূরের কথা, বার্ষিক সভাতে (এজিএমে) পর্যন্ত ডিপোজিটরদের ডাকা হয় না।

প্রচলিত ব্যাংকগুলোতে ডিপোজিটররা ঋণ প্রদানকারী। তাই বোর্ড অব ডিরেক্টরে তাদেরকে রাখার কিংবা এজিএমে ডাকার প্রশ্ন ওঠে না। সেই তুলনায় ইসলামি ব্যাংকগুলোর গ্রাহকরা বিনিয়োগকারী। তাই আইনত তাদের অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে। একটি ইসলামি ব্যাংক যখন দেউলিয়া হয়ে যায়, তখন গ্রাহকরা সব লোকসান বহন করে । বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো সহায়তা করে না। সাবেক আল বারাকা ব্যাংক যা পরবর্তীতে আইসিবি ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়েছে, যখন সমস্যায় পড়ল, এবং ডিপোজিটরদের অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হলো, তখন বাংলাদেশ ব্যাংক যুক্তি দেখাল যেহেতু ইসলামি ব্যাংকের গ্রাহকরা মুদারাবা বিনিয়োগকারী, তারাই সব ক্ষতি বহন করবে। তাই বাংলাদেশ ব্যাংক কাউকে ক্ষতিপূরণ দেয় নাই। এভাবে ডিপোজিটররা তাদের সব টাকা খুইয়ে ফেলে। অন্যান্য ইসলামি ব্যাংকের বেলায়ও এই কথা সত্য। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকে ডিপোজিটরদের টাকা সরকার কর্তৃক বীমা করা থাকে এবং ব্যাংক দেউলিয়া হলে গ্রাহকরা ক্ষতিপূরণ পায়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, পরিসংখ্যান অনুযায়ী ব্যাংকের মোট মূলধনের সিংহভাগ আসে ডিপোজিটরদের থেকে। ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের পেইড আপ ক্যাপিটাল যখন ছিল প্রায় ৭০০ কোটি টাকা, তখন ডিপোজিটরদের প্রদান করা অর্থের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ কোটি টাকার অধিক। অর্থাৎ, ডিপোজিটরদের টাকাতেই ব্যাংক চলে। কিন্তু তাদের অধিকার একেবারে নগণ্য।

আরেকটি দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, ডিপোজিটরদেরকে মোট লাভের অংশ দেয়া হয় না। কেবলমাত্র যেই পরিমাণ টাকা ব্যাংক কর্তৃক ঋণে খাটানো হয় সেখান থেকে অংশ-বিশেষ দেওয়া হয়। অথচ ঋণ কোনো ব্যাংকের আয়ের একমাত্র উৎস না। বিভিন্ন সার্ভিস ফি থেকে ব্যাংক মোটা অংকের টাকা লাভ করে যার কিছুই মুদারাবা সঞ্চয়ীরা পায় না। সবমিলিয়ে অর্থ দাঁড়াল যাদের টাকাতে ব্যাংক চলে, তারাই সবচেয়ে বঞ্চিত। এমন প্রতারণাপূর্ণ হিসেবের শরই ব্যাখ্যা কী তা আমাদের জানা নেই।

আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে ব্যাংক যখন নিজে ঋণ দিচ্ছে তখন ঋণ দিচ্ছে মুরাবাহা পদ্ধতিতে। অর্থাৎ, ব্যাংক লাভ লোকসানের ভাগ বহন করে না।

কিন্তু ব্যাংকে যারা মুদারাবায় টাকা রাখছে তারা লোকসানের ভাগ পুরাটা বহন করছে। এখানে একটি বিরাট নৈতিক স্খলনের সুযোগ আছে। কোনো ইসলামি ব্যাংক যদি লাভ কম করে দেখাতে পারে তাহলে প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় তাকে কম ব্যয় করতে হবে। একটি প্রচলিত ব্যাংকে সুদের হার আগের থেকেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে বিধায় তাদের জন্য এমন সুযোগ নেই। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকে যেহেতু সুদের হার অনির্দিষ্ট এবং তা লাভ-ক্ষতির সাথে সংযুক্ত, একাউন্টিং-এর মারপ্যাঁচে কম লাভ দেখাতে পারলেই ব্যাংক 'প্রকৃতপক্ষে' বেশি লাভ করতে পারবে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক।

কোনো ইসলামি ব্যাংক যদি এই বছর ৫০০ কোটি টাকা লাভ করে এবং সেখান থেকে ডিপোজিটরদের ৫০% বা ২৫০ কোটি টাকা দেয়, তাহলে তার হাতে থাকে ২৫০ কোটি টাকা। কিন্তু এই ব্যাংক যদি ৪০০ কোটি টাকা লাভ দেখাতে পারে, ডিপোজিটরদের দিতে হবে ২০০ কোটি টাকা। তাই তার হাতে থাকবে ৩০০ কোটি টাকা, যেহেতু প্রকৃত লাভ ৫০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, অডিটরদেরকে সন্তুষ্ট করে হিসেব ম্যানেজ করে ফেলতে পারলেই ৫০ কোটি টাকা বাড়তি।

কিন্তু বাস্তবে কি এমনটা হচ্ছে? বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ ব্যবসা পত্রিকা বণিক বার্তা'র ডিএমডি বলেন, "বাস্তবে ঠিক তাই হচ্ছে। ইসলামি ব্যাংকগুলো অডিটরদের ঘুষ দিয়ে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর থেকে আরো বেশি লাভ করছে।" এই ব্যাপারে কথা বলতে সম্মত হন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বিশেষজ্ঞ*। বাংলাদেশ ইসলামি ব্যাংক লিমিটেডের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে তিনি এই ব্যাংকের ফাইনান্সিয়াল তথ্য নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করেছেন ২০১৬-২০২০ সাল পর্যন্ত। কাজের সূত্রে এমন কিছু বিষয় তার কাছে প্রকাশ পায় যা তিনি নিজেও আশা করেননি। সাক্ষাৎকারে বার বার নিশ্চিত করে তিনি বলছিলেন যে বাস্তবে যেই ধরনের ফাইনান্সিইয়াল রিপোর্ট আমরা দেখছি তা একেবারেই ভুল। ব্যাংকের তার নিজেদের অনুকূলে লাভ নিতে এবং গ্রাহকদের বঞ্চিত করতে সরাসরি হিসেবে গড়মিল করে রিপোর্ট তৈরি করছে। তার পাশাপাশি এমন সব ব্যক্তির সাথে ব্যবসা (ঋণ লেনদেন) করছে যারা সরাসরি হারাম কাজে লিপ্ত যেমন সন্ত্রাসী, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎকারী

* এই সাক্ষাৎকারটি ২০২২ সালে বিশ্লেষকের নিজ অফিসে নেওয়া।

ইত্যাদি। পুরো ব্যাপারটার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক তো নেই-ই বরং সবমিলিয়ে ইসলামি ব্যাংকগুলো বর্তমানে 'সুদের চেয়ে লাভজনক', 'ব্যবসার চেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ' এবং 'মুসলিমদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়'। তাই সব ব্যাংক এমনকি মোবাইল ব্যাংকও গণহারে ইসলামি করণের দিকে ঝুঁকছে।

ক্যাপিটাল গেইন

ক্যাপিটাল গেইন কী তা বুঝাতে একটি ছোট গল্পের অবতারণা করি। মনে করি, মণি ও মুক্তা ৫০ হাজার, ৫০ হাজার টাকা করে মোট এক লক্ষ টাকার একটি মিয়াজাকি গাছ কিনে বাড়িতে রোপণ করল। গাছটি প্রতি বছর ৩০ হাজার টাকার আম দেয়। এর থেকে মণি রাখে ১৫ হাজার টাকা লাভ এবং মুক্তা রাখে ১৫ হাজার টাকা লাভ। বছর বছর গাছটি বড় হতে লাগল এবং বেশি বেশি আম দিতে থাকল। সময়ের সাথে মূল্যস্ফীতির কারণে আমের দাম বাড়ল, কাঠের দামও বাড়ল। এভাবে ১০ বছর যাবার পর গাছটির দাম কত হতে পারে? যেহেতু গাছটি বড় হয়েছে এবং মূল্যস্ফীতি হয়েছে, আমরা আর কিছু বলতে পারি বা না পারি, এতটুকু নিশ্চিত বলা যায় যে এর দাম ১ লক্ষ টাকা হতে বেশি হবে। আরেকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। ধরুন, আজকে আপনি ১ কোটি টাকার পুঁজিতে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করলেন। দিন যত গেল, আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তত বড় হতে লাগল, সকলের কাছে পরিচিতি পেল, মুখে মুখে নাম ছড়িয়ে পড়ল। পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতির কারণে সব পণ্য ও সেবার মূল্য বেড়ে গেল। এভাবে অনেক দিন যাবার পর কেউ আপনার থেকে যদি ১ কোটি টাকায় এই ব্যবসা কিনতে চায়, আপনি কি রাজি হবেন? নিশ্চয়ই না। কারণ এর মাঝে মোট সম্পত্তি বা পুঁজির পরিমাণ বেড়ে গেছে। বছর বছর পুঁজি যে এভাবে বাড়ে ইংরেজিতে তাকে বলে ক্যাপিটাল গেইন। আর বছর বছর আয় যে বাড়ে তাকে ইংরেজিতে বলে রেভেনিউ গেইন। অর্থাৎ, ব্যবসা করলে দুই প্রকার লাভ পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে চলতি আয় এবং আরেকটি হচ্ছে পুঁজি বৃদ্ধি।

তাহলে ইসলামি ব্যাংকে মুদারাবা বিনিয়োগ করে কেন গ্রাহকরা চলতি লাভের কিয়দাংশ পাবে? ক্যাপিটাল গেইনের অংশ কেন পাবে না? ব্যাংক তো

এখানে ম্যানেজার। ম্যানেজার যদি গ্রাহকের টাকাকে দশ বছরে দশ গুণ করে ফেলার পর ভাগ না দেয় তা কি এক প্রকার জুলুম নয়? এই ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পরবর্তী অধ্যায়ে যাওয়া যাক।

মুশারাকা ও মুদারাবা

যদু একটি ব্যবসা শুরু করার উদ্যোগ নিল। কিন্তু তার হাতে পর্যাপ্ত টাকা ছিল না। ব্যবসা করতে ১ কোটি টাকা মূলধন প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তার হাতে ছিল কেবল ৫০ লক্ষ টাকা। তাই যদু গেল তার ধনী প্রতিবেশী মধুর কাছে। মধু বলল, "আমি ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ দেই? তুমি প্রতি বছর ১০% সুদ দিয়ো। তারপর আমাকে ৫০ লক্ষ টাকা ফেরত দিয়ো।" যদু বলল, "না, তুমি বরং বিনিয়োগ কর।" সেই মোতাবেক মধু ও যদু ৫০ লক্ষ-৫০ লক্ষ টাকা করে একত্রে ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করল।

ব্যবসা শুরু করার পর প্রতি বছর ৮ লক্ষ টাকা লাভ আসতে থাকল। সেখান থেকে মধু নিল ৪ লক্ষ টাকা এবং যদু নিল ৪ লক্ষ টাকা। এভাবে এক যুগ যাবার পর ব্যবসাটি ১২ কোটি টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হলো। সেখান থেকে জনপ্রতি ৬ কোটি-৬ কোটি করে ভাগাভাগি করে নিল। এটাই হলো অংশীদারিত্ব ব্যবসা বিনিয়োগ বা মুশারাকা।

এবার যদুর প্রতিবেশী সাম চিন্তা করে দেখল সে নিজেও ব্যবসা করবে। কিন্তু ব্যবসা শুরু করার মতো কোনো টাকাই তার হাতে ছিল না। তাই সে গেল রামের কাছে। রাম তখন সামকে ১ কোটি টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এই ব্যবসা তুমি চালাও। লাভের তিন ভাগের এক ভাগ তুমি নেবে এবং দুই ভাগ আমাকে দেবে। তবে সব টাকাই যেহেতু আমি দিয়েছি, এই ব্যবসার সম্পদের মালিক হব আমি। তুমি সম্পদের মালিকানা পাবে না এবং ঝুঁকিও নেবে না। তাই কোনো বছর লোকসান হলে তার ভাগও তুমি পাবে না। তুমি কেবল ম্যানেজার এবং ম্যানেজমেন্ট ফি হিসেবে লাভের ৩৩% পাবে।"

এই ধরনের চুক্তি হচ্ছে মুদারাবা যা অর্থনৈতিকভাবে যৌক্তিক এবং ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় পর্বে। ব্যবসা করে সাম অনেক লাভবান হলো। সবমিলিয়ে ব্যবসা আগের তুলনায় অনেক বড় হলো। তখন সাম ১ কোটি টাকা রামের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "যেহেতু প্রতি বছর বছর লাভের ভাগ নিয়েছ, এই ১ কোটি টাকার অধিক কোনো পাওনা তোমার নেই। পুরা ব্যবসা আমার। তুমি কেবল এই ১ কোটি টাকা নিয়ে বাড়ি চলে যাও।" এটা এক প্রকার জুলুম। যেহেতু সম্পূর্ণ ব্যবসা রামের পুঁজি এবং রামই সকল ঝুঁকি নিয়েছে। তাই সেই সব সম্পত্তির মালিক। কিন্তু সাম করছে তার উল্টো।

চিন্তা করে দেখুন– আপনি যদি একটি জমি ১ কোটি টাকা দিয়ে কিনে কোনো কৃষকের হাতে তুলে দিয়ে বলেন, "তুমি যা ফসল ফলাবে তার তিনভাগের একভাগ আমার, দুইভাগ তোমার", তাহলে তা হচ্ছে মুদারাবা। কিন্তু বছর বছর এই জমি চাষ করে কৃষক আপনাকে ধান দেওয়ার পরে হঠাৎ একদিন ১ কোটি টাকা ধরিয়ে দিয়ে যদি বলে, "জমিটি আমি আবার ১ কোটি টাকা দামে নিজের নামে নিয়ে নিলাম!"

এমন হিসেব কি কেউ মেনে নেবে? হয়তো মানবে, যদি জমির দাম আগের সমান থাকে। কিন্তু যদি জমির দাম আগের তুলনায় দশ গুণ বেড়ে যায়, সেক্ষেত্রে কি তা মানা সম্ভব? ঠিক এমন কাজটিই করছে ইসলামি ব্যাংকগুলো। তারা গ্রাহকদের যা বুঝায় তা যদি গল্পের সাথে মেলানো যায় তা হচ্ছে, "১ কোটি টাকা দিয়ে জমি কিনেছিলেন। ১ কোটি টাকা ফেরত নেন। এর মাঝে তো ফসলের ভাগ দিয়েছিই। আবার দুই কথা কিসের?" অর্থাৎ মুদারাবা হিসাবে আপনি ব্যবসায় ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এখন ১ কোটি টাকা ফেরত নিয়ে যান। এর মাঝে বছর বছর যেই সুদ দিয়েছি তাই আপনার পাওনা।

কিন্তু আপনি যদি ইসলামি ব্যাংকগুলোর শেয়ারের দাম দেখেন, খেয়াল করবেন যে শেয়ারহোল্ডাররা একই সাথে ডিভিডেন্ড (চলতি আয়) পাচ্ছে এবং শেয়ারের দামও দিন দিন বাড়ছে (ক্যাপিটাল গেইন)। কিন্তু শেয়ার বাজারে শেয়ারের দামের সাথে মুদারাবার সঞ্চয়ীদের দরদামের কোনো মিল নেই। যদিও উভয় পক্ষ ব্যবসার মালিক। আপনার ১০,০০০ কোটি টাকাকে ম্যানেজমেন্ট ১০ বছরে ৩০,০০০ হাজার কোটি টাকা বানিয়ে ফেলল। ঝুঁকিও আপনার। কিন্তু আপনাকে ফেরত দিল ১০,০০০ কোটি টাকা। এ কেমন বিনিয়োগ? না, এইটা কোনো বিনিয়োগ না, ব্যবসাও না। এইটা ঋণ। কারণ,

১। ঋণের হিসেব হয় টাকাতে। তাই যা ধার দিয়েছেন, মেয়াদ শেষে তার সমান টাকা ফেরত আসে। কিন্তু বিনিয়োগের হিসেব হয় সম্পদে, তাই সম্পদের দাম অংশীদারিত্ব অনুযায়ী ফেরত আসে।

২। ঋণদাতা কোনো ব্যবসা ঝুঁকি নেয় না। তাই আপনি কাউকে ৮% সুদে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ দিলে দুই বছর পরে ৫০ লক্ষ টাকাই ফেরত পাবেন। টাকার বিনিময়ে টাকা। কিন্তু বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকি বহন করে ও টাকা দিয়ে মালিকানা কিনে। তাই সে মালিকানার অংশ পায়। অংশীদারিত্বের বিনিময়ে অংশীদারিত্বের হিসেব।

আপনি পৃথিবীর যেকোনো ব্যবসা বিনিয়োগের চুক্তির সাথে ইসলামি ব্যাংকের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসেব যদি মিলিয়ে দেখেন, কোনো মিল খুঁজে পাবেন না। সত্যি কথা বলতে সাধাসিধে মুসলিম জাতি ছাড়া এমন অপমানজনক চুক্তি আর কেউ মেনে নেবে না। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসেবের সাথে আপনি যদি সুদের চুক্তি মিলিয়ে দেখেন, উভয়ের মাঝে অদ্ভুত মিল খুঁজে পাবেন। ইসলামি জ্ঞানের জগতের বাইরের কোন অর্থনীতিবিদ; হোক সে চীনা, জাপানি কিংবা আর্জেন্টাইন অর্থনীতিবিদ, তথাকথিত 'মুদারাবার' হিসেব দেখে বলবেন, "এইটা নিশ্চয়ই সুদের চুক্তি।" কারণ বিশ্বজুড়ে সুদের চুক্তি প্রায় এভাবেই হয়ে থাকে। তাই কেউ বলবে না এইটা ব্যবসা বিনিয়োগ। পৃথিবীর ইতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কেউ কোনো ব্যবসা মডেল দেখাতে পারবে না যেখানে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যেই পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করে, বছরের পর বছর ক্যাপিটাল তার সমান থাকে। কিছুমাত্র বাড়ে বা কমে না। কিন্তু বাড়ির দাম, জমির দাম, জাহাজের দাম, দোকানের দাম থেকে শুরু করে সব কিছুর দাম এক পয়সা হলেও পরিবর্তীত হয় বাজার ব্যবস্থার সাথে। একমাত্র ইসলামি ব্যাংকগুলোর চুক্তিতে ক্যাপিটালের পরিমাণ ধ্রুব থাকে। এক কথায় মুদারাবার নামে কোনো ব্যবসাই চলছে না। চলছে ঋণ আদান প্রদান। তবে হ্যাঁ, সুদের সাথে এর একটি পার্থক্য এই যে, সুদে লোকসানের ভাগ গ্রাহকদের ধরিয়ে দেওয়া হয় না, কিন্তু এখানে তাও ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাই ইসলামি ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হয়ে গেলে গ্রাহকদের মাথাতেই কাঁঠাল ভাঙে। সবমিলিয়ে গ্রাহকের জন্য এটি সুদের চেয়েও নিকৃষ্ট চুক্তি।

টীকা : ইসলামি ক্রেডিট কার্ড

ইসলামি ব্যাংকিং খাতে নতুন একটি সংযোজন হচ্ছে ইসলামি ক্রেডিট কার্ড। কিন্তু একটি ব্যবসা (কাগজে কলমে) প্রতিষ্ঠান কীভাবে ঋণ দিবে? যেখানে ইসলামে ঋণ বলতেই বুঝায় লাভবিহীন লেনদেন?

এই সমস্যা দীর্ঘ দিনের। তাই ১৯৭০ সালে গড়ে উঠা ইসলামি ব্যাংকিং খাত ২০০১ সাল পর্যন্ত বাজারে কোন ক্রেডিট কার্ড আনেনি। কিন্তু ২০০১ সালে মালয়শিয়ায় সর্বপ্রথম ইসলামি ক্রেডিট কার্ড উন্মুক্ত করা হয়। ঋণ দেওয়ার বিনিময়ে যেহেতু কোন প্রকার লাভ নেওয়া অবৈধ, ইসলামি ব্যাংকগুলো ক্রেডিট (ঋণ) কার্ডের মাধ্যমে ব্যবসা বাহানা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই ব্যবসা বাহানার কয়েকটি পদ্ধতি আছে, যাদের মধ্যে একটি হচ্ছে 'বায় আল ইনা'। এই ব্যবস্থায় ব্যাংক একটি পণ্য ক্রেতার কাছে বাকিতে বিক্রয় করে কম দামে নগদে কিনে নেয়। কেউ যদি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ৪ বছরের জন্য ৫০ হাজার টাকা ধার চায়, এই ঋণের বিপরীতে প্রচলিত ব্যাংকের সুদের হার অনুযায়ী (ধরি ২০ %) ৪ বছরে ৯০ হাজার টাকা দাম নির্ধারণ করে পণ্যটি বাকিতে বিক্রি করে দেয়। তারপর একই পণ্য ৫০ হাজার টাকায় ব্যাংক কিনে নেয়। এভাবে ৪০ হাজার টাকা সুদ আসে। মালয়শিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া এলাকায় এই পদ্ধতিটি বেশ জনপ্রিয় ছিল তবে এটি এখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণ, এই মোডে গ্রাহকের সাথে পুনঃ ক্রয় বা ইনা হচ্ছে বিধায় এর তীব্র সমালোচনা রয়েছে। তাই বর্তমানে বাজারে এসেছে তাওয়াররুক কার্ড, যেখানে তৃতীয় পক্ষ ব্যাংকের হয়ে পুনঃ ক্রয় বা ইনা সম্পন্ন করে দেয়। তবে এই মোডে যেহেতু ব্যাংক নিজেই তৃতীয় পক্ষ নিয়োগ করে এবং এর দ্বারা সুবিধা পায় পদ্ধতিটি বৈধ হওয়ার ব্যাপারেও ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। তারপরেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এই পদ্ধতিটি বেশ জনপ্রিয়।

প্রকৃতপক্ষে, ক্রেডিট কার্ড বলতে যা বুঝায়– বিনা সুদে স্বল্প মেয়াদী ঋণ; তা কর্জে হাসানা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব না। তাই ইসলামি ব্যাংকগুলো সম্প্রতি কর্জে হাসানার নীতি অনুসরণ করে লাভজনক

ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থা চালু করেছে। এর নাম 'উজরা'। উজরা শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে সেবা মূল্য, ইংরেজিতে সার্ভিস ফি। এই ব্যবস্থায় কার্ড হোল্ডাররা মাসে মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি'র বিনিময়ে কর্জে হাসানা পায়। কার্ডগুলোতে কর্জে হাসানার উপর ৪০ দিনের মত লিমিট থাকে। কোন গ্রাহক যদি ঋণ নিয়ে টাকা ফেরত দিতে ৪০ দিনের বেশি সময় লাগিয়ে ফেলে তাকে গুণতে হয় বাড়তি টাকা। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার কার্ডে রয়েছে ঋণ নেওয়ার ভিন্ন ভিন্ন সীমা এবং যেই কার্ডের বিপরীতে ঋণ নেওয়ার সীমা যত বেশি, সেই কার্ডের সার্ভিস ফি ও এনুয়াল ফি তত বেশি। একজন ব্যক্তি চাইলে ওভার লিমিট ফি দিয়ে কার্ডের নির্ধারিত সীমার অধিক ঋণ নিতে পারবে। এগুলো ছাড়াও রয়েছে বছর বছর বিভিন্ন প্রকার লেনদেনের উপর জটিল জটিল সব ফি। কর্জে হাসানার মূলনীতির সাথে এই চর্চাগুলো এত দিক দিয়ে সাংঘর্ষিক যে বলা যায় সুদকে হালাল করতে গিয়ে কর্জে হাসানাকে হারাম বানিয়ে ফেলার মত অবস্থা।

সুদের সর্বনাশা ফাঁদ

এবার আমরা আলোচনা করব সুদ এবং ব্যবসার অর্থনৈতিক পার্থক্য নিয়ে। তারপর আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব ইসলামি ব্যাংকগুলো কোন পর্যায়ে পড়ে।

সুদ এবং ব্যবসার অর্থনৈতিক পার্থক্যটা অনেক সময় আমাদের বুঝে আসে না। প্রশ্নটি হয়তো আপনাকেও চিন্তিত করেছে যে বাড়ি ভাড়া দিয়ে লাভ করা হালাল হলে টাকা ভাড়া দিয়ে লাভ করা হারাম কেন? হারাম তো বটেই, এটি একেবারে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মতো! তাই আমাদের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে সুদ এত খারাপ কেন?

সুদ এবং ব্যবসার মধ্যে পার্থক্যের অর্থনৈতিক কারণ 'ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য' বইটি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছে। সেখানে দেখানো

হয়েছে ব্যবসার সাথে সুদের মূল পার্থক্য হচ্ছে ঋণের ফাঁদ। ঋণের ফাঁদ জিনিসটা কী, তা এখানে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাক।

মনে করুন, আমার হাতে আজকে দুই কোটি টাকা আছে। এই দুই কোটি টাকা ঋণ হিসেবে দিয়ে আমি ভবিষ্যতে চার কোটি টাকা ফেরত নেব (ধরি, পাঁচ বছরে)। সুদে ঋণ দিলে সবাই এমনটাই করে। খুব স্বাভাবিক। যাই হোক, এই চার কোটি টাকা ফেরত পাবার পর আমি নিশ্চয়ই নেতিয়ে পড়ব না। বরং, আবারো ঋণ দিয়ে আরো পাঁচ বছর পরে আট কোটি টাকা ফেরত নেব। সেই আট কোটি টাকা দিয়ে আমি নিশ্চয়ই ধ্যান করব না; বরং, পুনরায় টাকাটা ঋণ দিয়ে মোট ষোলো কোটি টাকা ফেরত নেব। এভাবে সুদের চক্র চালাতে থাকলে কালের পরিক্রমায় একটি অর্থনীতির সবগুলো মুদ্রা আমার হাতে চলে আসবে। বাস্তবে একটি অর্থনীতিতে যেহেতু একাধিক সুদি মহাজন থাকেন, তাদের সকলের হাতেই সম্মিলিতভাবে টাকার মালিকানা চলে আসবে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে ভালোভাবে বুঝানো যাক।

মনে করুন, একটি অঞ্চলে সব মিলিয়ে এক লক্ষ মানুষ বসবাস করে। তারা সবাই সোনার মোহর দিয়ে কেনাবেচা করে। ধরি, এই অঞ্চলটিতে সব মিলিয়ে মোট ১০ লক্ষটি মোহর আছে এবং সেগুলো দিয়েই সবাই লেনদেন ও সঞ্চয় কাজ সম্পন্ন করে। বড় দেখে একটি লোহার সিন্দুক কিনে আমি সেই এলাকায় গেলাম। তারপর 'বিশ্বাস ব্যাংক' নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করলাম। এবার সবার কাছে আমি প্রচার করলাম, "ঘরে মোহর না রেখে ব্যাংকে রাখুন। সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।"

সিন্দুকে মোহর রাখা নিরাপদ দেখে এবং আমার উপর বিশ্বাস করে মানুষ আমার ব্যাংকেই মোহর জমা করতে শুরু করল। এভাবে মোট ৩০,০০০ টি মোহর আমার সিন্দুকে জমা পড়ল। সব মোহর সিন্দুকে ফেলে না রেখে আমি ২৫,০০০টি মোহর ঋণ হিসেবে দিয়ে দিলাম এবং বাকি ৫,০০০টি মোহর জরুরি প্রয়োজনের জন্য হাতে রাখলাম যেন কেউ ডিপোজিট ভাঙিয়ে টাকা তুলতে আসলে তুলতে পারে।

এবার হিসেব কষে দেখুন, সুদের হার বিশ শতাংশ হলে পাঁচ বছরে সুদে-আসলে ঋণ গ্রহীতাদের থেকে আমি ফেরত নেব ৫০,০০০ টি মোহর। তারপর সেগুলো পুনরায় ঋণ দিয়ে আবার ফেরত নেব ১ লক্ষটি মোহর। তারপর এই দুই লক্ষটি মোহর ঋণ দিয়ে দিয়ে ফেরত নেব চার লক্ষটি

মোহর..। এভাবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ঐ অঞ্চলের ১০ লক্ষটি মোহর আমার হয়ে যাবে। বর্তমান ব্যাংকব্যবস্থা দ্বারা এমন হচ্ছে কিনা কিংবা হতে যাচ্ছে কিনা? ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা এক্ষেত্রে ভিন্ন ভূমিকা পালন করে কিনা? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার আগে কয়েকটি অভিযোগের উত্তর দিয়ে নিই।

প্রথমত, অনেকে বলতে পারেন একজন মহাজনের দ্বারা এতটা সফল হওয়া সম্ভব না কিংবা এই চক্র অনেক দীর্ঘ। এটি শেষ হওয়ার আগেই তিনি মারা যেতে পারেন, ইত্যাদি। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ করুন, কোনো মহাজন যদি এত দ্রুত সফল নাও হন কিংবা এত বেশি সুদের হার নাও রাখেন, তাতেও সমীকরণের ফলাফল বদলাবে না। সুদ (এবং ইসলামি ব্যাংকিং) হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে আপনি যেই পরিমাণ টাকা দিচ্ছেন তার থেকে বেশি পরিমাণ টাকা কুক্ষিগত করছেন। তাই মহাজন একদিন না একদিন সবকটি মুদ্রার মালিকানা অর্জন করবেই। তিনি মারা গেলেও তার পরিবার সব মুদ্রা অর্জন করবে।

দ্বিতীয় আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে এই যে একটি অঞ্চলে কেবলমাত্র একজন মহাজন থাকেন না। অনেকেই থাকেন। তাই উপরে বর্ণিত ফলাফল কোনদিন সংগঠিত হবে না। এই কথাটিও ভুল। কোনো এলাকায় একাধিক সুদি মহাজন (বা ইসলামি ব্যাংক) থাকলে তারা সবাই মিলে এলাকার সব মুদ্রার মালিক হয়ে যাবে এবং সম্মিলিতভাবে সেই অঞ্চলের মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবেন।

এগুলো মোটেও তাত্ত্বিক কোনো ফলাফল না। এমনটা ইতিহাসে হয়েছে এবং বর্তমানেও হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেও কেউ কেউ যুক্তি প্রদর্শন করেন, বর্তমানে যেহেতু আমরা ধাতব মুদ্রা বা কড়ি ব্যবহার করছি না এবং সময়ের সাথে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেহেতু বর্তমান যুগে এমনটি হবে না। এই আশা যে গুঁড়ে বালি তা আমরা অচিরেই দেখতে পাব। আমরা দেখব কিভাবে ব্যাংক নিজেই টাকা তৈরি করে এবং তা ঋণ দিয়ে সুদে আসলে ফেরত নেয়। সবমিলিয়ে আমাদের অর্থনীতি ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ব্যবস্থায় পুরোপুরি প্রবেশ করে ফেলেছে। সেই সূক্ষ্ম কৌসল বোঝার আগে ঋণের ফাঁদের সাথে দেউলিয়াত্বের সম্পর্কটা ভালোভাবে জেনে নেই।

দেউলিয়াত্ব

একটি এলাকার সবকটি মুদ্রা মহাজন বা ব্যাংকারদের হাতে চলে যাবার পরে কী হবে? প্রথমত, এলাকার সব মুদ্রা ব্যাংকারদের (বা ইসলামি ব্যাংক) হাতে চলে গেলেও জীবন থেমে যাবে না। কারণ, মুদ্রাগুলোর মালিকানা ব্যাংকারদের হাতে থাকলেও ঋণ হিসেবে তা পুনরায় সমাজে প্রবেশ করবে এবং ঘুরে ফিরে সবার দ্বারা ব্যবহৃত হবে। এই ঋণ যে সবাইকে আলাদা আলাদাভাবে নিতে হবে তা নয়। কিছু বড় বড় শিল্পপতি ঋণ নিতে থাকলেই চলবে। কারণ, তাদের বিনিয়োগ, ব্যবসা ব্যয়, কর্মচারী বেতন ইত্যাদির মাধ্যমে টাকাটা সমাজের সবার হাতে হাতে প্রবেশ করবে এবং বহমান নদীর স্রোতের মতোই অর্থনীতিতে প্রবাহিত হতে থাকবে।

এমন একটি সমাজের যেহেতু সব টাকাই ঋণ, এই দায় সুদে আসলে পূরণ করতে সবাইকে টাকার পিছে মরিয়া হয়ে ছুটতে হবে। যারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছেন তারা গরিব মানুষের থেকে শেষ টাকাও ছিনিয়ে নিতে কার্পণ্য বোধ করবেন না, কারণ এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এই ব্যবস্থার মাঝে লুকিয়ে থাকা শুভংকরের ফাঁকিটি কি আপনাদের চোখে পড়ল? লক্ষ করুন, একটি অঞ্চলে যদি ১০ লক্ষ মোহর থাকে এবং এগুলোর মালিকানা ব্যাংকগুলোর হাতে থাকে, তারা সবাই মিলে সুদে আসলে ১১ লক্ষটি মোহর ফেরত চাইবে। কিন্তু ১০ লক্ষটি মোহর দিয়ে ১১ লক্ষটি মোহরের দায় পূরণ হবে কিভাবে?

ঋণ নেবার পর সবাই মিলে যত দুর্নীতি, অত্যাচার এবং লুটপাট করুক না কেন, সব ঋণ তারা কোনদিনই পূরণ করতে পারবে না। তাই ঋণ গ্রহীতাদের কিছু সংখ্যককে অবশ্যই দেউলিয়া হতে হবে। তারা দেউলিয়া হওয়ার সাথে সাথে তাদের সম্পত্তি ব্যাংকের কাছে চলে আসবে। এভাবে ব্যাংক দিন দিন সম্পদশালী হতে থাকবে এবং সমাজ দিন দিন জীর্ণশীর্ণ হতে থাকবে।

প্রশ্ন হচ্ছে ইসলামি ব্যাংক কি ভিন্ন কোনো ভূমিকা পালন করে? উত্তর হচ্ছে– না। কারণ, অন্যান্য ব্যাংকের মতোই ইসলামি ব্যাংকও যা দেয়, তার চেয়ে বেশি ফেরত নেয়। তাই উপরের উদাহরণে প্রত্যেক জায়গায় ব্যাংক বা সুদি মহাজন কেটে ইসলামি ব্যাংক লিখে দিলে সমীকরণের ফলাফলে কোনো পরিবর্তন আসবে না।

টীকা : আলাপ-আলাপনে অর্থনীতি

মনে করি, সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন একটি এলাকায় যেমন রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলের কোনো গ্রামে আপনি কিছু সংখ্যক কড়ি ঋণ দিলেন। তারপর তা সুদে-আসলে অধিক পরিমাণে ফেরত চাইলেন। যেহেতু আপনার কড়ি ছাড়া সেই সমাজে আর কোনো কড়ি নেই, এই ঋণ কোনদিন শোধ করা সম্ভব হবে না।

স্বভাবতই, ঋণ নেয়ার পর সুদের কড়ি সংগ্রহ করতে সবাই নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেবে। মারামারি, খুনা-খুনি করাটাও অস্বাভাবিক না। কিন্তু আপনি "ক" সংখ্যক কড়ি ঋণ দিলে সবাই মিলে ফেরত দিতে পারবে সর্বোচ্চ "ক" সংখ্যক কড়ি।

কড়ি যেহেতু ডিম পাড়ে না, সুদে আসলে কোনদিন "ক+খ" সংখ্যক কড়ি ফেরত দিতে পারবে না। তাই কিছু গ্রাহক দেউলিয়া হয়ে যাবে এবং তাদের সম্পদ জব্দ করে আপনি আপনার নিজের নামে লিখে দেবেন। এই হচ্ছে ব্যাংকব্যবস্থার শুভংকরের ফাঁকি যা ইসলামি ব্যাংকগুলোও খেলে।

উপরের ঋণের চক্র যে একবারে, শেষ হয়ে যাবে এমন নয়। ব্যাংকের কাছে বার বার দেউলিয়া হওয়ার পরও সমাজ এর থেকে মুক্ত হতে পারবে না। কারণ ব্যাংক সকল টাকার মালিক এবং মানুষ টাকা ছাড়া চলতে পারে না। তাই ঋণ নেওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। কাউকে না কাউকে ঋণ নিতেই হবে। এভাবে প্রতিদিন নতুন নতুন ঋণ গ্রহীতা তৈরি হবে এবং নতুন ঋণ গ্রহীতাদের মধ্য থেকেও কিছু সংখ্যককে দেউলিয়া হতে হবে। তারপর তাদের সম্পত্তিও ব্যাংকারদের হাতে চলে যাবে। এভাবে ব্যাংকাররা বছর বছর ঋণ ও দেউলিয়ার চক্র চালাতে থাকবে এবং মানুষের সম্পদ নিজের নামে লিখতে থাকবে।

এমন একটি সিস্টেম দাঁড় করাতে পারলে আপনার হাতে সম্পত্তি অর্জনের মেশিন চলে আসবে। আপনি যে বুদ্ধির জোরে সম্পদশালী হবেন তা নয়। আপনি সবার মনের অজান্তেই তাদের সম্পদ কৌশলে চুরি করবেন। হোক সে ইসলামি ব্যাংক কিংবা প্রচলিত ব্যাংক। কিছু ব্যক্তিকে বেতন দিয়ে

সিস্টেমটি চালানোয় নিয়োজিত করতে পারলেই ব্যস নিশ্চিন্ত। আপনার আর কোনো কাজ বা দায়িত্ব থাকবে না। কেবল মাত্র এই মেশিনটি গায়ের জোরে সমাজে ধরে রাখতে পারলেই হলো।

এক্ষেত্রে সব ব্যাংক-কে ইসলামি ব্যাংক বানিয়ে দিলেও যা লাউ তা কদুই থাকবে। তাহলে একবার ভাবুনতো, যারা ইসলামি ব্যাংকে কাজ করছে তারা তাদের সমস্ত মেধা নিংড়ে কি শুধুই নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ছে? নাকি তাদের মেধা ও শ্রম দ্বারা আশপাশের সবকিছুর পতন ও জুলুম ত্বরান্বিত করছে?

ব্যাংকব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য

আপনি যদি পরিসংখ্যানের দিকে নজর দেন তাহলে দেখতে পাবেন ২০০৯ সালে বাংলাদেশের সকল ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩,৯৬,৫৮০ কোটি টাকা। কিন্তু ২০২০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৪০,৬০০ কোটি টাকায়!

অর্থাৎ, মাত্র ১১ বছরে ব্যাংকের মোট সম্পদ (ঋণ + পুঁজি) বেড়ে গেছে প্রায় ৫ গুণ! কোনো একটা সেক্টরের মোট সম্পদ যদি ১১ বছরে ৫০০% বেড়ে যায়, তাহলে কল্পনা করুন সেটা কি পরিমাণ মুদ্রা ও সম্পদ জমা করছে নিজের কাছে।

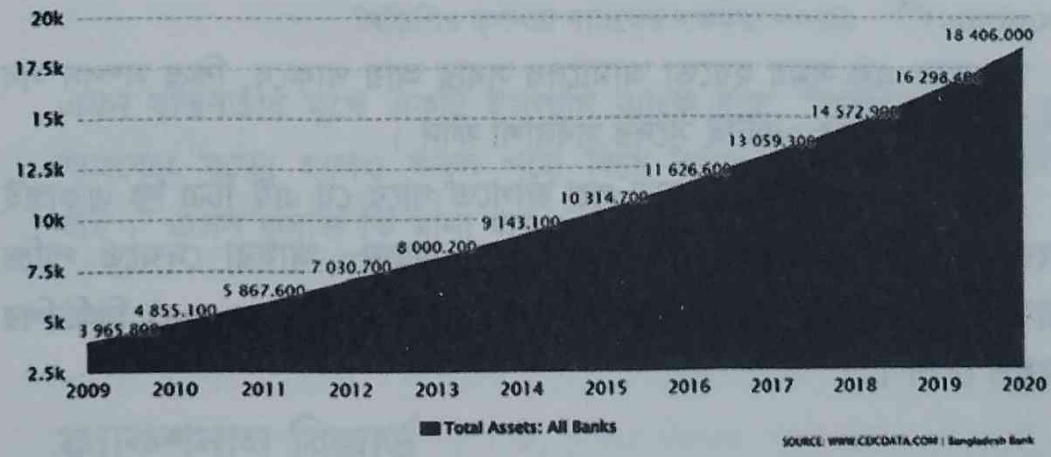

বাংলাদেশের সকল ব্যাংকের মোট সম্পদ (শত কোটি টাকায়),
সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক, চিত্রায়ণে : ceicdata[১১]

১১ https://www.ceicdata.com/en/bangladesh/banking-sector-assets-and-eposits/total-assets-all-banks

হয়তো ভাবছেন, সময়ের সাথে দেশের আয় রোজকার বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই হিসেবে মোট সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে এমনটাই স্বাভাবিক। আপনার ধারণা ভুল। কেবল মোট সম্পত্তিতে নয় বরং দেশের মোট জিডিপির শতাংশ হারেও ব্যাংকের সম্পত্তি অনেক বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের জিডিপির তুলনায় সকল ব্যাংকের শতকরা সম্পত্তি

দ্বিতীয় চিত্রে খেয়াল করে দেখুন ১৯৭৪ সালে যেখানে জিডিপির ৬.৮১ শতাংশ ছিল ব্যাংকের সম্পত্তি বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭.৩৭ শতাংশে। অর্থাৎ সুদের জালে ফেলে ব্যাংক সাধারণ মানুষের সম্পদ আস্তে আস্তে নিজের করে নিচ্ছে। (সূত্র : IMF, চিত্রায়ণে– The global economy)[১২]

এভাবে এক সময় হয়তো আমাদের সবার আয় থাকবে, কিন্তু সম্পদ সব হয়ে যাবে ব্যাংকের। এটাই সুদের সর্বনাশা ফাঁদ।

এই মুহূর্তে আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে এই চিত্র কি একান্তই বাংলাদেশি? নাকি বৈশ্বিক? শেষ চার্টে লক্ষ করুন– আমরা দেখতে পাচ্ছি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে এখন ব্যাংকের মোট সম্পদ (Asset) জিডিপির চেয়েও বেশি।[১৩]

---

১২ https://www.theglobaleconomy.com/Bangladesh/bank_assets_GDP/

১৩ https://www.theglobaleconomy.com/rankings/bank-assets-GDP/

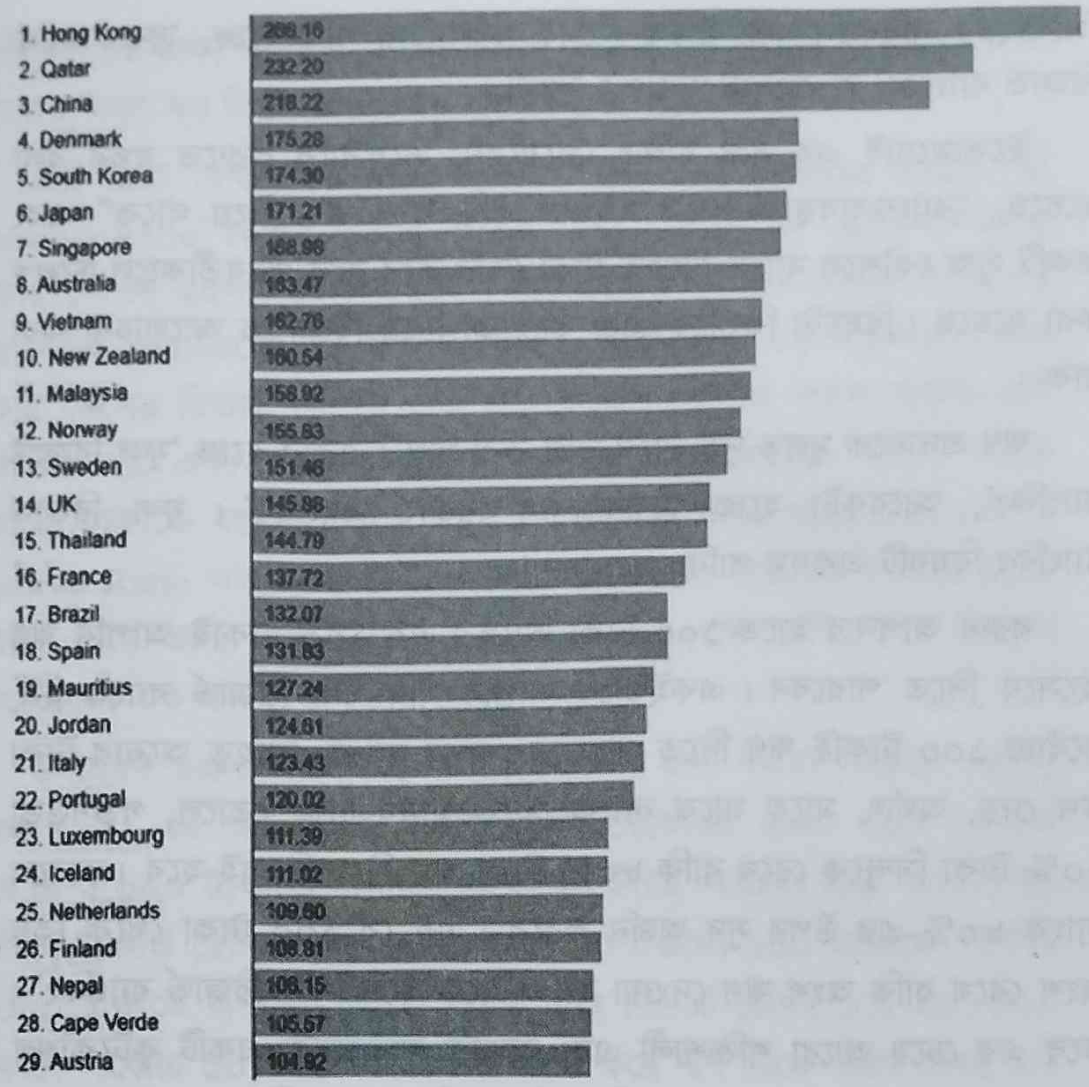

জিডিপির তুলনায় ব্যাংকের শতকরা সম্পত্তি

এমন বাস্তবতার মুখে একটি ইসলামি ব্যাংক বলে, "সবদিক থেকে প্রচলিত ব্যাংকের মতো হলেও কবুল পড়ে বিয়ে করার মতো আমরা হালাল হয়ে যাই।" এমন কুযুক্তি কি মানা যায়?

ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ

এবার আমরা আলোচনা করব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে শক্তিশালী অভিযোগটি নিয়ে। সেটা হলো 'টাকা তৈরি' করা। এটা একটা আন্তর্জাতিক টপিকও বলা যায় কারণ পৃথিবীর কোনো ব্যাংকব্যবস্থাই এর থেকে মুক্ত নয়। সমস্যাটির সমাধান করতে গিয়ে বাঘা বাঘা অর্থনীতিবিদও বলছেন যে পুরো

সিস্টেমের পরিবর্তন করা উচিত। সেই সমস্যাটার নাম হচ্ছে, 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং' বা বাংলায় আংশিক সঞ্চয়।

ইতোমধ্যেই এর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত পেয়েছেন, একেবারে শুরুতে যখন বলা হয়েছে, "ব্যাংকব্যবস্থা টাকাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে ঋণ দিয়ে থাকে" এবং একটি সূক্ষ্ম কৌশলে ব্যাংক নিজেই টাকা তৈরি করে বলে পরবর্তীকালে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টা কিভাবে কাজ করে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

ঋণ প্রদানকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে 'ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং', আরেকটা হচ্ছে 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং'। ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং বিষয়টি একদম পানির মতো সোজা।

ধরুন আপনার হাতে ১০০ টাকা আছে। এই ১০০ টাকাই আপনি ঋণ হিসেবে দিতে পারবেন। একইভাবে আপনি যদি ফুল রিজার্ভ ব্যাংক হন, সর্বোচ্চ ১০০ টাকাই ঋণ দিতে পারবেন। তবে ব্যাংক যেহেতু অন্যের টাকা ঋণ দেয়, অর্থাৎ, মাঝে মাঝে ব্যাংক থেকে মানুষ টাকা তোলে, গড়পড়তা ২০% টাকা সিন্দুকে রেখে বাকি ৮০% টাকা ঋণ দিয়ে দিলেই হবে। তাহলে ব্যাংক ৮০%-এর উপর সুদ অর্জন করবে। এই যে ১০০ টাকা থেকে কিছু অংশ রেখে বাকি অংশ ঋণ দেওয়া হয় এটাকে বলে 'ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং'। তবে এর চেয়ে আরো শক্তিশালী এবং অত্যন্ত লাভজনক একটি কূটকৌশল আছে। একে বলে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং। তা কিভাবে কাজ করে ব্যাখ্যা করা যাক।

ধরুন, আপনার কাছে ১০০ টাকা আছে। আপনি আপনার ৫ জন বন্ধুকে বললেন, আমি তোদের প্রত্যেককে ঋণ দেব। তারপর তাদের প্রত্যেককে ১০০ টাকা করে মোট ৫০০ টাকা ব্যবহার করার লাইসেন্স দিয়ে বললেন, আমার প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংকের) চেক দেখিয়ে নিজেদের মতো করে টাকাটা খরচ করো, আর এই টাকার বিনিময়ে ২০% হারে সুদ দিয়ো। অর্থাৎ, ৫০০ টাকার বিনিময়ে ২০% হারে আপনি বছরে মোট ১০০ টাকা সুদ পাবেন। এই যে হাতে থাকা টাকার অতিরিক্ত টাকা আপনি ঋণ দিয়ে দিলেন এই সিস্টেমটাকেই বলে 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং'। একমাত্র ব্যাংকব্যবস্থাই এই কাজটি করতে পারে। বাস্তবে আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে এমন করতে পারেন না এবং কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও এমন করতে পারে না।

অর্থাৎ ব্যাংক টাকা বানাতে পারে, যেটার মালিক সে নিজেও না! এবং সেই বানানো টাকা ঋণ দিয়ে তার উপর সুদও নিতে পারে!!!

এই তথ্য বিশ্বাস না হলে আপনি 'Required Reserve Ratio' বা 'Reserve Ratio' বিষয়ে পড়তে পারেন। আরো ভালো হয় 'ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য' বইটি পড়লে। যাই হোক, এই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভের হার, যাকে ইংরাজিতে বলে রিজার্ভ রেশিও, সারা বিশ্বে এক সমান না। এক একটি দেশের রিজার্ভ রেশিও এক এক রকম। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক এটি নির্ধারিত হয় এবং সেই অনুযায়ীই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের হাতে জমানো টাকাকে বহুগুণ করতে পারে।[১৪] এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে যেই দেশের Reserve Ratio যত কম, সেই দেশের ব্যাংকগুলো তত বেশি টাকা তৈরি করতে পারে এবং যেই দেশের Reserve Ratio যত বেশি, সেই দেশের ব্যাংকগুলো তত কম টাকা তৈরি করতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর জন্য বর্তমান রিজার্ভ রেশিও হচ্ছে ৫%। এর অর্থ দাঁড়ায় বাংলাদেশের যেকোনো ব্যাংক ১০০ টাকাকে সর্বোচ্চ ২,০০০ টাকাতে রূপান্তর করে ঋণ দিতে পারবে! কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমান রিজার্ভ রেশিও যদি ১০% হতো ব্যাংকগুলো ১০০ টাকাকে সর্বোচ্চ ১,০০০ টাকাতে রূপান্তর করতে পারত এবং রিজার্ভ রেশিও ১% হলে ১০০ টাকাকে সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকাতে রূপান্তর করে ঋণ দিতে পারত এবং তার উপর সুদ অর্জন করতে পারত!

এবার আপনারা আশা করি বুঝে গেছেন ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেম কিভাবে কাজ করে। চমকপ্রদ তথ্যটি হচ্ছে আধুনিক ইসলামি ব্যাংকগুলোও 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ' নীতিতে টাকা তৈরি করে চলছে। এমনকি তারা তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে বিষয়টি স্বীকার করে।[১৫]

---

১৪ t.ly/VRLt

১৫ https://www.islamibankbd.com/abtIBBL/cis-issues-and-problems-of-islamic-banking.php

গভীরে ভাবুন

ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ পদ্ধতির প্রভাব ভালো করে বুঝতে বিষয়টি নিয়ে আরেকটু বিশ্লেষণ করা যাক। মনে করুন, ইসলামি ব্যাংকের একজন প্রতিষ্ঠাতার নাম বিপ্লব। ব্যাংক খোলার প্রথম বছরেই সে সেভিংস অ্যাকাউন্টে ১০০ টাকা জমা পেল। এবার সে তার 'আইনগত অধিকার' খাটিয়ে ২০ জন গ্রাহককে ১০০ টাকা করে মোট ২০০০ টাকা ঋণ দিল। ২০% সুদের হারে ১০০ টাকায় ১ বছরে সুদ আসবে ২০ টাকা, তাহলে ২০ জনের প্রত্যেককে ১০০ টাকা করে ঋণ দিলে মোট সুদ আসবে ৪০০ টাকা।

অর্থাৎ, এক বছর আগে বিপ্লবের হাতে ছিল ১০০ টাকা। এখন তার হাতে আছে ৫০০ টাকা। ধরা যাক, কিছু আইনি জটিলতার কারণে সে ৫% রিজার্ভ রেশিওর পূর্ণ ব্যবহার করতে পারল না। আরো ধরা যাক, কিছু ঋণ বিফলে গেল। এভাবে সব মিলিয়ে তার হাতে আসল ৩০০ টাকা। এখন কর্মচারী বেতন ও আনুষাঙ্গিক খরচ বহন করার পর পুরোটাই বিপ্লবের লাভ। খেয়াল করুন, যিনি ব্যাংকের থেকে ঋণ নিয়ে প্রচলিত ব্যবসা করেছেন তিনিও নিজ কর্মচারীদের বেতন দিয়েছেন, হয়তো কিছু টাকা খুইয়েছেনও। এগুলো ছাড়াও তিনি আরো কিছু আনুষঙ্গিক খরচ করেছেন। তিনি কিন্তু এত লাভ করতে পারেননি। তার কারণ কী? তার কারণ হচ্ছে তিনি ব্যাংকের মতো টাকা তৈরি করতে পারেননি। এটা ব্যাংক এবং ব্যবসার মধ্যে অন্যতম একটি পার্থক্য। ব্যাংক টাকা তৈরি করতে পারে। ব্যবসায়ীরা টাকা তৈরি করতে পারে না। ইসলামি ব্যাংক কর্তৃক আবিষ্কৃত তথাকথিত মুরাবাহা, বায়-মুয়াজ্জাল এবং শিরকাতুল মিল্ক ব্যবসা চুক্তি হলেও যদি হয়ে থাকে, ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং করা একটি প্রতিষ্ঠানকে কি আমরা কোনদিন ব্যবসা বলতে পারি?[১৬]

এই ব্যাপারে ইসলাম ধর্ম কী বলেছে তা জানলে আপনি আরো অবাক হবেন।

> "যা তোমার অধিকারে নেই তা তুমি বিক্রয় কোরো না।"
>
> *– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২১৮৭)*

তাহলে টাকা না থাকা অবস্থাতেই টাকা ঋণ দিয়ে দেওয়া (ইসলামি ব্যাংকের ভাষ্যমতে ব্যবসা করা) কিভাবে হালাল হতে পারে? গবেষণা জগতে

---

১৬ 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং' কিভাবে ইসলামি শরিয়ার আইনের সাথে একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ না সেটা বিস্তারিত জানার জন্য প্রফেসর আহমেদ কামিল মাইদিন মিরা ও আরো ৩ জন গবেষকের যৌথভাবে লেখা গবেষণাপত্র 'Fractional Reserve Banking and Maqasid Al-Shariah: An Incompatible Practice?' পড়ে দেখতে পারেন। প্রফেসর আহমেদ কামিল মিরা প্রফেসর ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ার অর্থনীতি ও ম্যানেজমেন্ট সাইন্স বিভাগে এবং ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স-এর ডিন হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর গবেষণাপত্রের লিংক দেয়া হলো– t.ly/dUgT

যারাই ইসলামি অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং নিয়ে পড়াশোনা করে, তারাই বলেন যে এটা মোটেই শরিয়াসম্মত পদ্ধতি না। Meera and Larbani (2009) তাদের গবেষণাপত্রে একে চুরির সাথে তুলনা করেছেন। 'আওফি'ও এই ব্যাপারটা জানে। আর ইসলামি ব্যাংকতো নিজেই স্বীকার করে নিয়েছে যে এটি বৈধ পদ্ধতি নয়।[১৭] কিন্তু এতকিছুর পরেও সকল ইসলামি ব্যাংক 'ফুল রিজার্ভ'-এ আবদ্ধ না থেকে সাধারণ সুদি ব্যাংকের মতোই লাভজনক 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ' পদ্ধতি চালিয়ে যাচ্ছে।

শেষ প্রশ্ন

অনেকগুলো আপত্তি আর স্খলনতো পেলেন ইসলামি ব্যাংকিং এর ব্যাপারে। এবার একটিবার ভাবুনতো, কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী এমন কোনো আয়াত বা হাদিস কি পেয়েছেন, যেখানে আল্লাহর রাসূল সা. আপনাকে আদেশ করেছেন কিংবা কোনভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, চেষ্টা কর মুসলিম ভাইদের সাথে শরিয়া অনুমোদিত ব্যবসা করার, আর যখন অন্য অঞ্চলে থাকবা, তখন তাদের মতো সুদের ব্যবসা করলে ক্ষতি নেই? এমন কোন ভাষ্য আছে যে, যারা সুদের ব্যবসা করে, তাদের সাথে তাল মিলিয়ে যতটুকু পার চল, বাকিটার জন্য ঝামেলা নাই?!

অথবা বলেছেন যে, তোমার কাছে যে মুদ্রা আছে তুমি এর থেকেও বেশি মুদ্রা ঋণ দিতে পারবা, যদি তোমার দেশ এরূপ আইন প্রণয়ন করে করে বা বাদশা অনুমতি দেয় বা তুমি নিজে ব্যাপারটা সামাল দিতে পার?

শুরুতে যেই প্রশ্নটি করেছিলাম, আজকে যদি বিশ্বের সমস্ত ব্যাংক-কে 'ইসলামি ব্যাংক' হিসেবে ঘোষণা করা হয়, আমরা কি 'সুদ-মুক্ত বিশ্ব' বা 'সুদ-মুক্ত অর্থনীতি' পেয়ে যাব কি? উত্তর হচ্ছে না।

ইসলামি ব্যাংক যেহেতু হারাম ব্যবসায় ঋণ দিচ্ছে না এবং কিছুটা ইসলামি আইন মেনে চলার চেষ্টা করছে সেই হিসেবে কি আমরা মন্দের

---

১৭ https://www.islamibankbd.com/abtIBBL/cis-issues-and-problems-of-islamic-banking.php

ভালো কিছু পাব? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে মুসলিম উম্মাহর উপর ইসলামি ব্যাংকগুলোর প্রভাব জেনে নেই।

এই পর্যন্ত আমরা দেখেছি ইসলামি ব্যাংকগুলো প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় ভিন্ন কোনো অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলতে পারে না। তাই মদের সাথে একটু মধু ও কালোজিরা মিশিয়ে বিক্রি করলে যেমন মদ 'মন্দের ভালো' কিছু হয়ে যায় না, ঠিক তেমনি, প্রচলিত ব্যাংকের সাথে কিছু ইসলামি দ্রব্য মিশিয়ে মূলনীতি অপরিবর্তিত রাখলে, তাও মন্দের ভালো হয় না। ব্যাংক ও সুদ অর্থনৈতিক বস্তু। অর্থনৈতিকভাবে ইসলামি ব্যাংক যদি ভিন্ন কিছু না দিতে পারে, সুদ থেকে বাঁচতে প্রচলিত ব্যাংক ছেড়ে ইসলামি ব্যাংকে যাওয়া কোনদিন সমাধান হতে পারে না। কিন্তু তারচেয়ে বড় একটি সমস্যা হচ্ছে ইসলামি ব্যাংকে গেলে সুদমুক্ত সমাজ পাওয়ার সম্ভাবনাও কমে আসবে। কারণ অন্যান্য ব্যাংক যেখানে স্বীকার করছে যে তারা সুদ খাচ্ছে, ইসলামি ব্যাংক সেখানে নিজেকে হালাল বলে দাবি করে ফেলছে।

এর একটি প্রত্যক্ষ ফলাফল হচ্ছে সরল প্রাণ মুসলিমদের বিশ্বব্যাপী সুদের জালে আটকা পড়া। আরেকটি সমস্যা হচ্ছে তারা তাদের মনের অজান্তেই সুদের মেশিনকে নিজ টাকায় শক্তিশালী করে তুলছে। এভাবে কষ্টার্জিত হালাল টাকা ঋণ-সুদে চক্র, দেউলিয়াত্ব বৃদ্ধি, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য তৈরি এবং টাকা-পূজারি সংস্কৃতি গড়ার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইসলামি ব্যাংক নামে কোন বস্তু না থাকলে হয়তো এই টাকাগুলো এমন কাজে ব্যবহৃত হতো না। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হচ্ছে এই যে ইসলামি ব্যাংকিং না থাকলে আজকে যারা সুদভিত্তিক সিস্টেমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারত তারাও এর প্রভাবে ভুল পথে চালিত হচ্ছে। কারণ তারা এতকিছু দেখে বিভ্রান্ত হয়ে একটি সুদমুক্ত সমাজ (বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান) গড়ার প্রচেষ্টা থেকে সরে আসছে বা ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থাকে না জেনে সমাধান মনে করছে। মুসলিম উম্মাহর জন্য এইটা কত বড় ক্ষতি! আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে যারা ইসলামি ব্যাংকিংকে মেনে নিতে পারছে না তারা বিপরীত পক্ষের সাথে যুক্তি-তর্ক এবং বিদ্বেষে জড়িয়ে পড়ছে। এভাবে উম্মাহ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে শক্তি অপচয় করছে। মানব জাতির সাধারণ শত্রু সুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতেই পারছে না।

এই সমস্যাগুলোর একটি সমাধান হচ্ছে জ্ঞানের বিকাশ। অনেক জটিল আরবি শব্দ এবং কূট-কৌশলী ভাষা দেখে অনেকে জানার আগ্রহও হারিয়ে

ফেলছে। এভাবে নিজেদের অবস্থানে কেউ বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গা থেকে শক্ত অবস্থানে থাকতে পারছে না। কেবল আবেগের তাড়নায় যুক্তিতর্ক করছে। এতে ভালো কিছুই হচ্ছে না, বরং এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে।

বইটি লেখার সময় অনেকেই এই প্রশ্ন করেছেন, "আপনার উদ্দেশ্য কী? আমরা সাধারণ মানুষজন কি কোনো উপকার পাব?"

সত্যি কথা বলতে বইটি লেখার সময় আমার উদ্দেশ্য ছিল একটি মহা ফাঁকি সবার সামনে সরল বাক্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া। কেউ যদি সত্য সন্ধানের মন নিয়ে, একেবারে সৎ নিয়তে বইটি পড়ে আশা করি সে জেনে যাবে– ইসলামি ব্যাংকিং কী?

ইসলামি ব্যাংকিং যেহেতু মন্দের ভালো না, এবং মুসলিম জাতির বিভ্রান্তের কারণ, এক্ষেত্রে মুসলিম জাতির বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে আমরা এখন কি ইসলামি ব্যাংক ছেড়ে প্রচলিত ব্যাংকের দিকে যাব?

একটি বিষয় ভুলে গেলে চলবে না যে সুদ ভক্ষণকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো অপরাধ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮] তিনি বলেন :

> "হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাকো। অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো, তবে তোমরা নিজেদের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার কোরো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।" *সূরা বাকারা - ২৭৯*

তাই সুদ থেকে বাঁচতে ইসলামি ব্যাংক ছেড়ে প্রচলিত ব্যাংকে যাওয়া কোনো সমাধানই হতে পারে না। ইসলামি ব্যাংক অবশ্যই পরিত্যাজ্য। তবে কেবল মাত্র বয়কট কোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে না। আমাদের সবাইকে সুদমুক্ত সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। এটাই হচ্ছে প্রকৃত সমাধান।

---

১৮ অনেকে একটি ব্যাপার সামনে আনতে চান যে ব্যাংকে টাকা রেখে আমি ইনফ্লেশন থেকে বাঁচার চেষ্টা করি। এই ক্ষেত্রে আমি বলব ইনফ্লেশন থেকে বাঁচতে গিয়ে যদি আপনি এমন কারো হাতে টাকা তুলে দেন যিনি এগুলো ব্যবহার করে সব সম্পদ নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করছে, আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তাহলে কি তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে? তাই মূল্যস্ফীতি থেকে বাঁচার জন্য আমরা ব্যাংকে টাকা না রেখে বরং বিনিয়োগ করার চেষ্টা করব।

অনেকে মনে করেন কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রেখে সুদমুক্ত জীবন যাপন করা সম্ভব। তবে এই চিন্তারও আমি তীব্র বিরোধী। কারণ কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রাখা মানে আপনার টাকাটা অন্য সব অ্যাকাউন্টের মতোই ব্যবহৃত হচ্ছে + সুদের মহাজনকে আপনি কিছু টাকা দান করছেন। এই ব্যাপারটি কেন ভয়ংকর তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করছি।

চিন্তা করে দেখুন, কোনো ডাকাত দলের সর্দার যদি আপনাকে দিয়ে চাঁদাবাজি করানোর পরে বলে, "তুই এই টাকার ১০% রেখে বাকি অংশটা আমাকে দিস।" আপনার আয় কি হালাল হবে?

উত্তরে আপনি চোখ বন্ধ করে বলতে পারবেন, "এই আয় কোনদিন হালাল হবে না।" কিন্তু আপনি যদি ১০% টাকা না রাখেন? ধরা যাক আপনি চাঁদা তুলে ডাকাত দলের সর্দারকে বলেন, "ওস্তাদ, এই টাকার পুরো অংশটাই আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম। আপনার থেকে যেই নিরাপত্তা পেয়েছি তাই আমার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমি চাই না আমার আয় হারাম হোক। আমি এখান থেকে কোনো টাকা নেব না।" এই সংলাপ শুনে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে আপনি হারাম থেকে বেঁচে গেছেন। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝবেন, আপনি অনেক বড় একটা ভুল করেছেন– আপনার টাকা ডাকাত দলের সর্দারকে দান করেছেন। এই টাকায় সর্দার অস্ত্র ও গোলা-বারুদ কিনে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে বেড়াবে। কারণ তার কাজই ওইটা।

কিন্তু আপনি যদি ১০% টাকা এলাকার মজলুমদের দান করতেন তারা জুলুমের কষ্টের মাঝে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেত। এর চেয়েও ভালো হতো, যদি আপনি ডাকাত দলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ব্যক্তিদের টাকাটা দিতেন। তবে আরো ভালো হতো আপনি যদি এই পেশায় নিযুক্তই না হতেন। তারচেয়ে ভালো হতো আপনি যদি ডাকাত দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন এবং সবচেয়ে ভালো হতো আপনি যদি এমন একটি বাহিনী প্রস্তুত করে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতেন। এটি ছাড়া নিরাপত্তার আর কোনো রাস্তা নেই।

উপরের গল্পটির মতোই ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রেখে সুদ না নিলে ব্যাংকই বেশি লাভবান হবে এবং সুদের ব্যবসা বড় হবে। আপনি যদি এই টাকাটা সোয়াবের নিয়ত ছাড়া অসহায়, দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত মানুষদের দান

করতেন তাহলে তা উত্তম হতো। তবে তার চেয়েও উত্তম হতো, যদি ব্যাংকব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদেরকে টাকাটা দান করতেন। আরো অনেক ভালো হতো ব্যাংকে কোনো টাকাই না রাখলে। এর চাইতেও উত্তম হতো ব্যাংকের বিকল্প কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করলে। সব চাইতে উত্তম হতো আপনি যদি এমন একটি সামাজিক আন্দোলনের কারিগর হিসেবে কাজ করতেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য– কেউ যদি বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকের সাথে যুক্ত হয়ে থাকেন, তা ভিন্ন কথা। প্রকৃতপক্ষে আমি নিজেও ব্যাংক থেকে মুক্ত হতে পারিনি, তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং অন্যকে চেষ্টা করতে উৎসাহিত করছি। এককথায় বিপদ দেখে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। অনেকে বলেন ব্যাংকে টাকা না রাখলে যেহেতু সম্পদের কোনো নিরাপত্তা নেই, বর্তমান সমাজে আমরা মজলুম। আমাদের যেহেতু আর কোনো রাস্তা নেই, ইসলামি ব্যাংকে টাকা রাখতেই পারি। এগুলো সম্পূর্ণ কুযুক্তি। চিন্তা করে দেখুনতো জীবনের নিরাপত্তার জন্য আমরা সবাই যদি ডাকাত দলে যোগ দিতে থাকি তাহলে আমাদের সমাজের অবস্থা কী হবে? বরং আজকে যুদ্ধে নামলে ৫০ বছর পরে হলেও সমাজ ইনশা-আল্লাহ বদলাবে। তাই হতাশ না হয়ে সুদমুক্ত 'সমাজ' গঠনের চেষ্টা অব্যহত রাখুন। এটি ছাড়া বাঁচার আপাতদৃষ্টিতে আর কোনো উপায় নেই।

টীকা : গ্রাহকদের জন্য কিছু বাস্তবভিত্তিক টিপস

অনেকে প্রশ্ন করবেন এই বই পড়ে আমরা জানতে পারলাম ইসলামি ব্যাংকগুলো ইসলামের নামে গ্রাহকদের ঠকাচ্ছে। মিথ্যাচার করছে। কিন্তু আমরা ডিপোজিটররা এখন কোথায় যাব; যতদিন না পর্যন্ত প্রকৃত ইসলামি ব্যাংক আসছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমত আমি বলি আপনি আপনার টাকা ইসলামি ব্যাংকে রেখেছেন কি সুদি ব্যাংকে রেখেছেন তার মাঝে বিশেষ কোনো পার্থক্য আমি দেখি না। তাই যেই ব্যাংকের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য ভালো সেখানে ডিপোজিট করলে দুনিয়ার জন্য উত্তম। আখিরাতের কথা চিন্তা করলে ব্যাংক ডিপোজিট যত কমানো যায় তত ভালো।

দ্বিতীয়ত, কোনো ইসলামি ব্যাংকের স্বাস্থ্য যদি খুব খারাপ হয় তার আশপাশে যাওয়া উচিত হবে না; কারণ, সেক্ষেত্রে আপনার সঞ্চয় যেকোনো মুহূর্তে শূন্য টাকা হয়ে যেতে পারে।

তৃতীয়ত, একটি ব্যাংকে অধিক টাকা রাখার চেয়ে একাধিক ব্যাংকে একটু একটু করে ডিপোজিট ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা উত্তম। কারণ কোনো ব্যাংক দেউলিয়া হলে, সেই অ্যাকাউন্টের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন আপনি। তাই একাধিক ব্যাংকে ১ লক্ষের কাছাকাছি অ্যামাউন্টের টাকা রাখা যেতে পারে। যেন আপনার সঞ্চয় সম্পূর্ণ বীমা করা থাকে।

চতুর্থত, আপনার হাতে বড় ডিপোজিট থাকলে অনেক ব্যাংকে টাকা রাখতে পারবেন না। তাই খুব নিরাপদ কোনো ব্যাংকে যার অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য খুব ভালো সেখানে রাখতে পারেন। তবে সবচেয়ে উত্তম হয় অধিক পরিমাণ টাকা ডিপোজিট না করে বিনিয়োগ করে ফেলা।

সমাধান

সুদের কি কোনো সমাধান আছে? বিশেষ করে বর্তমান অর্থ ও মুদ্রা ব্যবস্থায়। যদি থেকে থাকে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের রূপরেখা কেমন হবে?

খেয়াল করুন, ইসলামি ব্যাংকিং তাদের কিছু-কিছু চুক্তি এমনভাবে সাজিয়েছে যেন তারা সুদের সুবিধাগুলো উপভোগ করতে পারে। এজন্যই ইসলামি ব্যাংকিং মানবজীবনে প্রচলিত সুদের তুলনায় ভিন্ন কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নাই। কিন্তু প্রকৃত ইসলামি ফাইনান্সিং-এর এমন কিছু পদ্ধতি আছে যা ইসলামি ব্যাংক চাইলেই অনুসরণ করতে পারে এবং মানবজীবনে ভালো প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ এই পদ্ধতিগুলো প্রকৃত ব্যবসা বিনিয়োগের অনুরূপ।

মোটা দাগে ইসলামি ব্যাংকগুলোর ফাইনান্সিংকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. প্রকৃত ব্যবসা বিনিয়োগ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক লাভ লোকসানের অংশীদারিত্ব বহন করে। যেমন– মুদারাবা (এজেন্ট ব্যবসা), মুশারাকা (অংশীদারিত্ব ব্যবসা)

২. ব্যবসার বাহানা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক লাভ লোকসানের ভাগ বহন করে না। যেমন– মুরাবাহা, বায়-মুয়াজ্জাল ইত্যাদি।

সুদের সমীকরণে সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে হলে ইসলামি ব্যাংকগুলোকে প্রথম পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে। এভাবে মানুষের জীবনেও কিছু কল্যাণ আসবে।

দ্বিতীয়ত ইসলামি ব্যাংক-কে ডিপোজিট স্কিমের সংস্কার করতে হবে। বর্তমানের যেই ধোঁয়াশাযুক্ত এবং সন্দেহপ্রবণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে তা রাখা যাবে না। সকল ডিপোজিটরদের শেয়ার হোল্ডারের সমমানের মর্যাদা দিতে হবে।

উপরের দুটি পরিবর্তনই প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সমাধানযোগ্য। এই পরিবর্তনগুলো বাস্তবায়নে সরকারের কোনো ভূমিকা লাগে না। তাই ইসলামি ব্যাংকগুলোকে এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কিছু সমস্যা আছে যেগুলো সমাধানে ইসলামি ব্যাংকের পাশাপাশি সর্বোচ্চ পর্যায়ের সদস্যদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

প্রথম সমস্যাটি হচ্ছে 'কল মানি রেট'। এই জিনিসটা কী? কোনো কারণে একটি ব্যাংকের ক্যাশ টাকায় সংকট পড়লে সেই ব্যাংকটি জরুরি

ভিত্তিতে অন্যান্য ব্যাংক থেকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ নিয়ে কাজ চালায়। এই যে একটি ব্যাংক অন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়, এই ঋণের সুদের হারকেই বলে 'কল মানি রেট'।

একটি ইসলামি ব্যাংক যখন ক্যাশ সংগ্রহে বিপদে পড়ে তখন তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা থাকে না। যেমন ঈদের মৌসুমে যখন ক্যাশ টাকার সংকট পড়ে তখন ইসলামি ব্যাংক কারো থেকে কর্জে হাসানা নিতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও সুদমুক্ত ঋণ দেয় না। তাহলে ইসলামি ব্যাংক কিভাবে কার্য পরিচালনা করবে? কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারি নীতিমালা পর্যায়ে এই ব্যাপারে পরিবর্তন আসতে হবে। বিনা সুদে জরুরি ঋণ লেনদেনের একটি আন্তঃব্যাংক প্লাটফর্ম না থাকলে আদর্শ ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না।

গ্রাহক সচেতনতার বৃদ্ধি করা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাংলাদেশ ইসলামি ব্যাংক প্রথম যখন মুশারাকা বিনিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে আসে তখন অনেকেই ভুল হিসেব দেখিয়ে ব্যবসা লোকসান দেখাতে থাকে, যা একেবারে স্পষ্ট মিথ্যাচার। এভাবেই একটি সুন্দর প্রকল্প অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায়।

এর সমাধান স্বরূপ ব্যাংকের উচিত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড বা ইকুইটি ফান্ডের মডেল অনুসরণ করা। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক কোনো কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলে সেই কোম্পানির বোর্ডে অংশগ্রহণ করবে। সেক্ষেত্রে এই জাতীয় সমস্যা দূর করা সম্ভব। তাছাড়া সরকার কর্তৃক অডিট ফার্মের মান বৃদ্ধি করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে, যেন কোনো প্রতিষ্ঠান ইসলামি ব্যাংকের নামে (বা অন্য যেকোনো ব্যবসার নামে) কম লাভ দেখিয়ে কাউকে ঠকাতে না পারে। বর্তমানে কবজার* (মাল হস্তগত করা) বিষয়েও প্রচুর অনিয়ম হচ্ছে এবং এর জন্য অনেকাংশে গ্রাহকরাই দায়ী। তাই ইসলামি আইনের ব্যাপারে গ্রাহকদের জ্ঞান ও সচেতনতা থাকতে হবে।

এবার যেই আন্তর্জাতিক সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং। একটি দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা যদি ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে সেই দেশের মানুষের জীবন ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠির হাতে জিম্মি থাকে। ইসলাম কি এমন ব্যবস্থা মেনে নিতে পারে? কখনই না। তাই তো ইসলাম বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরা ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ পদ্ধতিকে হারাম

---

* ইসলামে মাল হস্তগত হওয়ার আগে বিক্রি করা নিষেধ।

বলেছে। কিন্তু রাষ্ট্র নিজেই যদি ব্যাংকগুলোকে এই অনুমতি দিয়ে দেয়, ইসলামি ব্যাংক কিভাবে চলবে?

এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করা সত্যই জরুরি। কিন্তু যারা এই বিষয়টি বুঝেন তারা মুখ খুলেন না, আবার যারা সব ব্যাপারে সরব তারা বিষয়টি বুঝেন না। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে তথাকথিত ইসলামি ব্যাংকগুলোও এই ব্যাপারে নীরব। তারা এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ না করে বা গ্রাহকদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা না করে জেঁকে বসে সব সুবিধা নিচ্ছে।

ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং দেখে হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। বাস্তবে ফুল রিজার্ভের ভিত্তিতেও ব্যাংক পরিচালনা করা সম্ভব। টাকা তৈরি করেই বিনিয়োগ করতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। পৃথিবীর কোনো বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান শূন্য থেকে টাকা তৈরি করে না। তাই একটি আদর্শ ইসলামি ব্যাংকও চাইলে ফুল রিজার্ভের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারে।

সবমিলিয়ে আদর্শ ইসলামি ব্যাংক হবে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে গ্রাহকরা টাকা জমা রেখে ব্যাংকের মালিকানা অর্জন করবে এবং ব্যাংক বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে সেগুলোর অংশীদার হবে। তারপরে ব্যাংক এই লাভের টাকা তুলে গ্রাহকের মাঝে মোট ডিপোজিটের পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টন করে দেবে।

আপনারা যারা ফাইনান্সের ছাত্র-ছাত্রী তাদের কাছে ধারণাটি বেশ পরিচিত লাগছে। জি, এটি হচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ড। প্রকৃত ইসলামি ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের মতোই হবে। আপনি এতটি হালাল মিউচুয়াল ফান্ড কিংবা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডকে প্রর্কৃত ইসলামি ব্যাংক বলতে পারেন। কারণ, বর্তমান ব্যাংকব্যবস্থা চলছে সুদ এবং ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভের উপর। এই দুটির কোনোটাই ইসলামি না। আপনি এদেরকে তুলে দিলেই ব্যাংক একটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডে পরিণত হয়ে যায়।

এবার আলোচনা করা যাক আনুষঙ্গিক কিছু বিষয় নিয়ে। ঋণ আদান-প্রদান করা ছাড়াও ব্যাংকগুলো চেক লেনদেন, রেমিট্যান্স প্রেরণ ও মানি ট্রান্সফারের কাজ করে থাকে। সেগুলো কিভাবে পরিচালিত হবে? উত্তর হচ্ছে এখন যেভাবে হয় সেভাবেই হবে। কারণ টাকা পাঠানো, রেমিটান্স অর্জন, লকার সেবা সুদ না। যেকোনো প্রতিষ্ঠানই এই সেবাগুলো প্রদান করে তার

বিনিময়ে সেবা মূল্য গ্রহণ করতে পারে। এগুলো সম্পূর্ণ ব্যবসা। একারণেই আমরা যখন মোবাইলে, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে বা ক্রিপ্টোতে টাকা লেনদেন করি তা সুদের আওতায় পড়ে না। ব্যাংক ছাড়া চলা সম্ভব এই কথা যেমন সত্য, ঠিক তেমনি এই কথাও সত্য যে ব্যাংকগুলো নিয়েই আমরা সুদমুক্ত সমাজ গড়তে পারি। ব্যাংকিং সেবার কেউ বিরোধিতা করছে না। বিরোধিতা করা হচ্ছে সুদের। ব্যাংক যদি সুদভিত্তিক লেনদেনকে পরিত্যাগ করে আনুষঙ্গিক সকল প্রকার সেবা অব্যাহত রাখে সব সমস্যার সুন্দর সমাধান হয়ে যায়।

সবশেষে আলোচনা করব ঋণ নিয়ে। ব্যাংক যদি অংশীদারিত্ব পদ্ধতিতে ব্যবসাই করে থাকে আমরা ঋণ পাব কোথা থেকে? ইসলামি অর্থনীতিতে কি ঋণের অস্তিত্ব থাকবে না?

অবশ্যই থাকবে, তবে তা হতে হবে সুদমুক্ত উপায়ে। এর জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে সুদমুক্ত ঋণ লেনদেনকে জোরদার করতে হবে এবং তার পাশাপাশি ঋণ ফেরত দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে।

ব্যক্তি পর্যায়ে কর্জে হাসানার পাশাপাশি সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থাও চালু করা সম্ভব। সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থা অবান্তর কিছু নয়। পাকিস্তানের আখুওয়াদ তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

সমস্যা হচ্ছে বর্তমান মুদ্রা ব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো যে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ছাড়া বড় পর্যায়ে সুদমুক্ত ব্যাংকগুলো কার্যনির্বাহ করতে পারে না। কিন্তু আধুনিক সমাজেও ক্ষুদ্র ঋণের বিকল্প হিসেবে সুদমুক্ত ঋণের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ খুব উত্তম ভূমিকা রাখতে পারে।

তা-সত্ত্বেও এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপ্রতুল। এর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি। অতিরিক্ত টাকা ছাপানোর ফলে একটি অর্থনীতিতে প্রতি বছর মোট টাকার পরিমাণ বাড়তে থাকে। এভাবে টাকা তার মূল্যমান হারিয়ে ফেলে। ঋণদাতাদের জন্য এটি অনেক বড় একটি সমস্যা। এই সমস্যার একটি সমাধান হচ্ছে টাকা বাদে অন্যান্য সম্পদে যেমন– ধান, তেল, রুপা, লোহা ইত্যাদিতে ঋণ লেনদেন করা। আরেকটি সমাধান হচ্ছে বিদেশি কারেন্সিতে লেনদেন করা। যেই সকল দেশের মুদ্রা খুব নিরাপদ এবং শক্তিশালী যেমন– ইউয়ান, সুইস ফ্রাংক, সেগুলো দ্বারা ঋণ

দিয়ে একই কারেন্সিতে ঋণ ফেরত নিলে এই ঝামেলা পোহাতে হবে না। তবে এক্ষেত্রে লেনদেন হতে হবে সত্যিকারের বস্তু বা টাকাতে। কেবল মাত্র স্বর্ণ বা ডলারের মূল্যমান ধরে অদৃশ্য লেনদেন করলে বাতিল হবে। সোনার বিনিময়ে সোনা বা ডলারের বিনিময়ে ডলার এভাবে ঋণ লেনদেন করতে হবে।

সুদমুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার আরেকটি সমস্যা হচ্ছে খরচ বহন করা। ঐতিহাসিকভাবে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান অনুদানের ভিত্তিতেই চলেছে। তবে একটি স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা গেলে উত্তম হয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যবসার মালিকানা যেমন– দোকান, গ্যারেজ ইত্যাদি জুড়ে দিলে আর চিন্তা করতে হবে না। দোকান বা গ্যারেজের ভাড়াতে প্রতিষ্ঠান চলতে পারবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো লোন প্রসেসিং করতে কর্মচারী বেতন, ভাড়া, নজরদারিসহ যা খরচ হয় তা গ্রাহকদের থেকেই তোলা সম্ভব। কারণ ঋণের প্রসেসিং ফি বাবদ ন্যায্য খরচ আদায় করা বৈধ। সুতরাং, সুদমুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা খুব বড় কোনো সমস্যা না।

সমবায় পদ্ধতি

সুদমুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সবচেয়ে আকর্ষণীয় উপায় হলো সমবায় পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটি সমবায়ের সকল সদস্যগণ প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা/ডিপোজিট দেবে। এভাবে ফান্ডের আকৃতি প্রতিনিয়ত বড় হতে থাকবে।

পরবর্তীকালে সমবায়ের সদস্যদের কারো ঋণ নেওয়া প্রয়োজন সে অবেদনপত্র জমা দেবে। আবেদনকারীদের প্রয়োজন ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই-বাছাই করে সদস্যরা ঋণ নেওয়ার অনুমোদন দেবে যা হবে সম্পূর্ণ সুদমুক্ত।

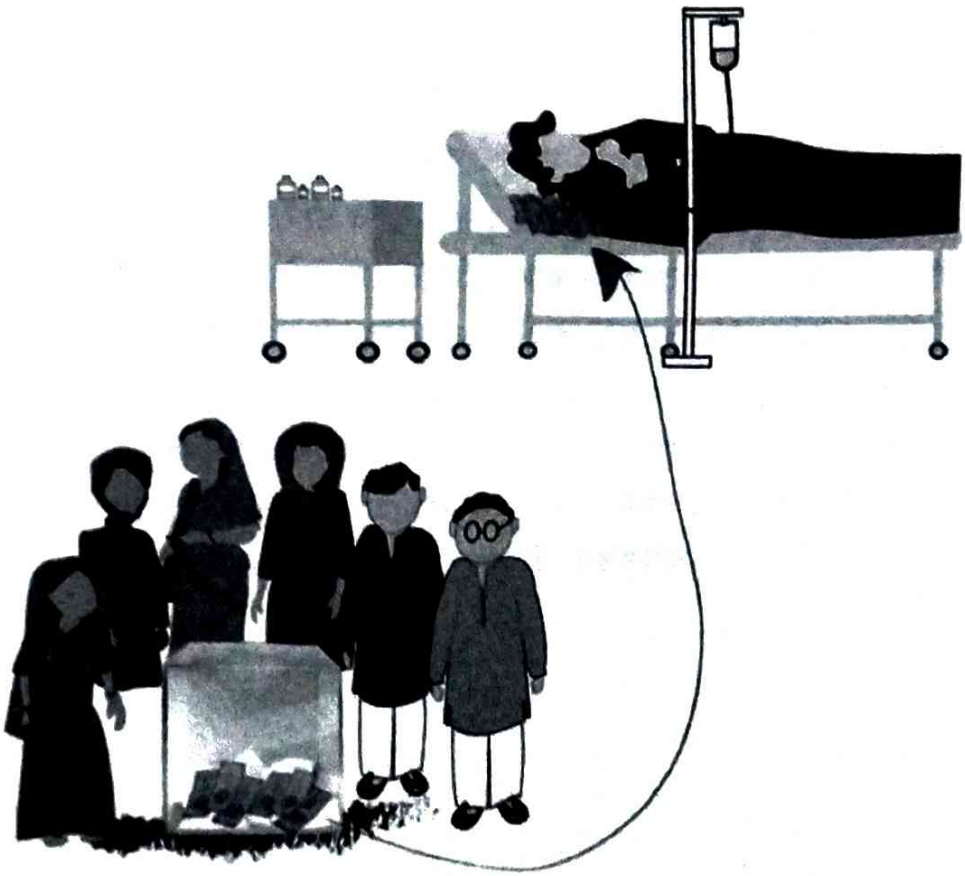

এই পদ্ধতিতে যেহেতু সকল সদস্যের উপকৃত হওয়ার সুযোগ আছে, কেউ এখানে টাকা জমা দিতে নিরুৎসাহিত হবে না। তাছাড়া একটি সমবায়ের সবাই একে অপরের খোঁজ-খবর রাখেন। এর ফলে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও নজরদারি ব্যয় হবে সামান্য। তবে পদ্ধতিটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো এখানে সময়ের সাথে টাকা তার মূল্যমানের ক্ষয় হওয়ার একটি সমাধান পেয়ে গেল। যেহেতু এখানে প্রতিটি সদস্যই বিপদের দিনে বিনা সুদে ঋণ সহায়তা পেতে পারে, তাদের সঞ্চয়ের ক্ষয় হওয়া মূল্যমান বিপদের দিনে সাহায্য পাওয়ার সেবা মূল্যের মতোই কাজ করবে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে সুদমুক্ত প্রতিষ্ঠানও জামানতের বিপরীতে ঋণ দেবে। প্রয়োজনবোধে জামিনদারও নিযুক্ত করবে যারা ঋণগ্রহীতার গ্যারান্টর হিসেবে কাজ করবে। এভাবে খুব কম অর্থই বিফলে যাবে এবং সকলে উপকৃত হবে।

সবমিলিয়ে আমরা দেখলাম কোনোপ্রকার সরকারি সহায়তা ছাড়াই কিভাবে বেসরকারি পর্যায়ে সুদমুক্ত ক্ষুদ্র-ঋণের প্রকল্প চালু করা সম্ভব। সরকার চাইলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও সুদমুক্ত উপায়ে ব্যাংকগুলোকে পরিচালনা করতে পারে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে কৃষিখাতে যেই পরিমাণ ভর্তুকি দিতে হয় তার সামান্য কিছু অংশে সম্পূর্ণ কৃষি ব্যাংকের খরচ চালানো সম্ভব। তাহলে আর অযথা কৃষকদেরকে সুদের জালে বন্দি রাখার প্রয়োজনীয়তা কি?

আমাদের মধ্যে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সুদ ছাড়া চলা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে সুদমুক্ত অর্থনীতি অধিক কল্যাণকর। তাই আমাদের জন্য এই মুহূর্তে মনোবল ধরে রেখে সামনে আগানো এবং প্রচেষ্টাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কথা সত্য যে, সুদ থেকে বাঁচা রাতারাতি সম্ভব না। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টা। আপনি আমি আমাদের জীবনে সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব এই আশা ব্যক্ত করছি।

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

এই বইটি লেখার ঘোষণা দেওয়ার পর পাঠক এবং সংশ্লিষ্ট মহলের পক্ষ থেকে বেশ কিছু প্রশ্ন এসেছে। সেগুলো একত্রিত করে এখানে উত্তর দেওয়া হয়েছে।

১. ইসলামি ব্যাংকের উত্থানকে অনেকেই ইসলামি পুনর্জাগরণের অংশ হিসেবে দেখছে। এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

HSBC ব্যাংক একদা ইসলামি উইন্ডো খুলেছিল। তার কিছুদিন পরেই সেটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।
কেন এমনটি হয়েছিল এই ব্যাপারে জানতে চাইলে ব্যাংকটির উর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা বলেন, "ইসলামি উইন্ডোটি সেই সময় লাভজনক ছিল না। তাই বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।" বর্তমানে সিটি ব্যাংকের ইসলামি শাখার প্রধানকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনিও জানান, "সিটি ব্যাংকের ইসলামি শাখা যদি ভবিষ্যতে লাভজনক হয় তাহলে সেটা টিকে থাকবে। আর যদি তা অলাভজনক হয়, তাহলে বোর্ড তা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেবে।" অর্থাৎ, লাভজনকতাই এখানে মূল ভূমিকা পালন করছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি ব্যাংকের উত্থান মানে ধর্মের উত্থান বলাটা ঠিক হবে না।

২. সবকিছুর সমাধান যদি ইসলামে থেকেই থাকে, ব্যাংকব্যবস্থার সমাধান কী?

এই প্রশ্নটি আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়। এর উত্তরে আমি বলি ব্যবসা। তবে অনেকেই এই উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারে

না। তারা বলে, 'আমরা নিরাপদে টাকা জমা রাখতে চাই কিন্তু ঝুঁকি বহন করতে চাই না। এক্ষেত্রে করণীয় কী?' তখন আমি বলি, "কর্জে হাসানা।" কিন্তু তাতেও অনেকে সন্তুষ্ট হতে চায় না। কারণ কর্জে হাসানায় অনেক সময় টাকা ফেরত পাওয়া যায় না। আবার অনেক সময় টাকা ফেরত পেতে দেরি হয়। এই সমস্যা কিভাবে দূর করা যায় সেই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করে 'সুদ হারাম কর্জে হাসানা সমাধান' বই লিখেছি। কিন্তু তারপরেও কর্জে হাসানা ১০০% নিরাপদ না। সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে ঘরের আলমারিতে বা ব্যাংকের লকারে টাকা রাখা (এইটা জায়েজ আছে, যেহেতু এখানে কোনো সুদ নেই)।

কিন্তু ব্যাংকে টাকা রেখে যেভাবে লাভবান হওয়া যায়, সেভাবে কর্জে হাসানাতে বা সিন্দুকে টাকা রেখে লাভবান হওয়া যায় না। তাই অনেকেই পাল্টা প্রশ্ন করে, "টাকা সঞ্চয় করে লাভবান হওয়ার হালাল উপায় কী?"

তখন বলতেই হয় বিনিয়োগ। কারণ বিনিয়োগ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে লাভ আছে ঝুঁকিও আছে। কর্জে হাসানা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ঝুঁকি নেই, লাভও নেই। কিন্তু সুদ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে ঝুঁকি নেই বললেই চলে কিন্তু লাভ আছে। এখন কেউ যদি সুদের সব সুবিধা হালাল উপায়ে পেতে চায়, তার উত্তর কী?

এই প্রশ্নটিই ত্রুটিপূর্ণ। এর কোনো উত্তর নেই। যেখানে ইসলাম সুদকে করেছে হারাম সেখানে আপনি কেন সুদের সব সুবিধা নিতে চাইবেন? আর সুদের সব সুবিধা যদি আপনি নিয়েই ফেলেন, সুদকে হারাম করার প্রয়োজনীয়তা কী? আপনি কি বলতে পারেন যে আমি মদ না খেয়েই মাতাল হওয়ার সমস্ত আনন্দ পেতে চাই। এর হালাল উপায় কী? অথবা আপনি কি প্রশ্ন করতে পারেন আমি জেনা না করেই জেনার পূর্ণাঙ্গ আনন্দ পেতে চাই। এর হালাল উপায় কী?

তাহলে সুদ না নিয়ে সুদের সব সুবিধা পেতে চাই। এর হালাল উপায় কী? এমন প্রশ্নও অবান্তর।

৩. গোটা বিশ্বের স্কলারদের 'ইজমা' আছে যেখানে, সেখানে আপনি কেন ইসলামি ব্যাংকিংকে শুভংকরের ফাঁকি বলছেন?

ব্যাংক কর্তৃক চালুকৃত অদ্ভুত মুরাবাহা, বায় ময়াজ্জাল ইত্যাদি জায়েজ কিনা সেইটা নিয়ে আলেমদের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্তি আছে। এই ইস্যুগুলো নিয়ে টেকনিক্যাল শরই আলোচনা করা বইটির সাধ্যের বাইরে।

তবে ইসলামি ব্যাংক-এর ব্যাপারে কোনো ইজমা নেই। কিছু কিছু আলেম এই ধরনের ধারণা পোষণ করেন যে যদিও বাহানা করে সুদের মতো লেনদেন করা হারাম, ইসলামি ব্যাংক সাময়িক সময়ের জন্য বাধ্যতার খাতিরে জায়েজ হতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রেও কিছু শর্ত যুক্ত আছে যেগুলো ঠিকমত মানা হয় না বলে অভিযোগ আছে।

যাই হোক, আমি ধরে নিলাম ইসলামি ব্যাংকিং-এর পক্ষের যুক্তিগুলোই সঠিক এবং বাকি সকলের মতামতই ভুল। তারপরেও কি ব্যাংকিং হালাল হয়ে যায়? ইসলামি ব্যাংকগুলো ঋণ গ্রহীতাকেই তার নিজের কাছে পণ্য বিক্রির এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছে। এটা কি জায়েজ? ইসলামি ব্যাংক শূন্য থেকে টাকা সৃষ্টি করে ঋণ দিচ্ছে। এই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং নাজায়েজের হওয়ার পক্ষেই ইজমা আছে। একে সরাসরি ধোঁকা ও গোপন চুরি বলে ইজতিহাদ (গবেষণা) আছে। কিন্তু সমগ্র ইসলামি ব্যাংকিংই টিকে আছে এই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেমের উপর। তাহলে কিভাবে এটি হালাল হয় বা হালাল হওয়ার পক্ষে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়?

৪. ইসলামি ব্যাংকিংকে ১০০ ভাগ হালাল কেউই বলছে না। এর সাথে ৫%-১০% সুদ যুক্ত আছে। এই আলোচনা কি সেই পুরনো কাসুন্দিই নতুন করে ঘেঁটেছে?

ইসলামি ব্যাংকিং খাতের ব্যক্তিবর্গ এমনটা দাবি করে থাকেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইন মেনে চলতে গেলে তাদেরকে বাধ্য হয়েই ৫%-১০% সুদের লেনদেন করতে হয়। তাই বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় শতভাগ সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না। প্রকৃত ইসলামি সরকার আসলেই কেবল ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যদিও এগুলো কুযুক্তি, বইটি সেই ১০% নিয়ে কথা বলেনি। বরং ইসলামি সরকার আসলেও যেই ৯০% অপরিবর্তিত থাকবে এবং বর্তমানে তারা যাকে হালাল বলছে সেই অংশটি নিয়েই বইটি ডিল করেছে।

৫. ইসলামি ব্যাংক প্রায়োগিক দিক থেকে হয়তো অনেক নিয়মই মানছে না। কিন্তু ইসলামি ব্যাংক যেই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে কি কোনো ভুল পরিলক্ষিত হয়?

ইসলামি ব্যাংকিং যেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে তা যে অর্থনৈতিকভাবে সুদের থেকে ভিন্ন কিছু দেবে না তা এই বইতে খুলে খুলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তারপরেও যুক্তির খাতিরে ধরে নিলাম ইসলামি ব্যাংক একটি ব্যবসা। তাহলে প্রশ্ন আসে এত লাভজনক ব্যবসাগুলো সবাই করছে না কেন? এই ব্যবসার লাভের হার সুদের হারের সাথে মিলে যাচ্ছে কেন? এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পলিসি রেটের সাথে লাভের হার হাতে হাত ধরে চলছে কেন, যা অন্য কোনো ব্যবসায় পরিলক্ষিত হয় না? অর্থাৎ, সবদিক থেকেই ইসলামি ব্যাংক সুদের অনুরূপ কিন্তু ব্যবসার বিপরীত।

তারপরেও যদি যুক্তির খাতিরে ধরে নিই এগুলো ব্যবসা, ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ বিষয়টা সামনে আনলে, সেই যুক্তিও ভেঙে পড়ে। এটি এতই শক্তিশালী একটি পয়েন্ট যে এর

সামনে কোনভাবেই ইসলামি ব্যাংককে ব্যবসা বলে দাঁড় করানো যায় না। অর্থাৎ, বর্তমানে ইসলামি ব্যাংকগুলোর কেবল প্রায়োগিক নয়, মৌলিক সমস্যাও রয়েছে।

৬. এমন কোনো পরিবেশ যদি পাওয়া যায় যেখানে ইসলামি ব্যাংকগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তাহলে কি তারা 'শুভংকরের ফাঁকি' থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে?

ইসলামি ব্যাংকগুলো শুভংকরের ফাঁকি থেকে বের হয়ে আসতে পারবে যদি তারা

১। বাহানা পরিত্যাগ করে

২। লাভ লোকসানের অংশীদার হয় এবং

৩। ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং ত্যাগ করে।

৭. সুদ ছাড়া কি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? একটি ইসলামি সমাজ ব্যাংক ছাড়া কিভাবে চলবে?

এই বিষয়টি আমাদের মজ্জার ভেতরে প্রবেশ করে গেছে যে ব্যাংক ছাড়া চলা অসম্ভব। তাই ইসলামি ব্যাংক তৈরি করতে হবে।

খেয়াল করে দেখুন, ব্যাংক ঋণ দেয়। আমরা যদি ঋণভিত্তিক জীবন যাপন পরিহার করি তাহলে ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? আমরা টাকা পাঠাতে, চেক লিখতে, রেমিট্যান্স আদায় করতে ব্যাংক ব্যবহার করি। এগুলোর কোনোটাই সুদ না। এগুলো ইসলামি সমাজে থাকতেই পারে। তার জন্য যে ব্যাংক থাকতে হবে এমন নয়। যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন Western Union এই কাজ করতে পারে। চাইলে মুসলিম সমাজ এমন একশোটি নতুন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে পারে। ব্যাংকের আরেকটি কাজ হচ্ছে সঞ্চয় করা। আমরা যদি লকারে টাকা সঞ্চয় করি এবং বেশি বেশি বিনিয়োগ করি, সুদ-ভিত্তিক ব্যাংকের

শরণাপন্ন হতে হবে না। কেউ চাইলে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারে অথবা ব্যবসা অংশীদার হতে পারে। ঝুঁকি না নিতে চাইলে কর্জে হাসানা বা লোহার সিন্দুক আছে। তাহলে ব্যাংক ছাড়া চলা কেন অসম্ভব? ইসলামি সমাজে কেন ব্যাংক থাকতেই হবে? যাই হোক, আমি যদি ধরেও নেই ব্যাংক ছাড়া চলা অসম্ভব, সুদ ছাড়া চলা অবশ্যই সম্ভব। কারণ আল্লাহ আমাদের জন্য এমন কিছু নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি যা থেকে আমরা বাঁচতেই পারব না। তাই না?

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা যখন ইসলামি সমাজের কথা চিন্তা করছি তখন বর্তমানে ফ্রেমে বন্দী থেকেই চিন্তাগুলো করছি। এজন্য অনেক কিছুই অসম্ভব মনে হচ্ছে।[১৯]

৮. এই বইটি পড়ে সাধারণ মানুষজন কিভাবে উপকৃত হবে?

মনে করুন, একদল পথিক মরুভূমিতে আছে। এমন সময় তারা একটি মরীচিকা দেখে পানির সন্ধানে এগিয়ে গেল। কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ একজন ব্যক্তি এসে বলল, "এইটা পানির উৎস নয়। এইটা একটা মরীচিকা। খেয়াল করে দেখ, তোমরা যতই আগাচ্ছ এইটা ততই দূরে সরে যাচ্ছে এবং এর আশপাশেও কোনো লোকালয় নেই। এভাবে আগালে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেদিকে যেয়ো না।"

যেই ব্যক্তি এই কথাগুলো বলল তিনি কি সবার উপকার করল না? তারপরেও কিছু পথিক বলবে, "যেহেতু আশপাশে আর কোনো পানির উৎস দেখছি না, আমরা ঐদিকেই যাব। সবাইতো একসাথেই আছি। যা হওয়ার সবার একসাথেই হবে। আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা কোরো না। নিজে পানির কোনো সন্ধান নিয়ে আসো অথবা দূর হও।"

---

১৯ বিস্তারিত জানতে পড়ুন 'ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য' বইটি।

এই কথাগুলো আমাদের নিজেদের জীবনেও চরম সত্য। ভুল মানুষের হতেই পারে। আপনি সমাধান চোখে দেখছেন না মানে এই না যে কোনো সমাধান নেই কিংবা চোখের সামনে যা দেখছেন তাই সমাধান। আমাদের উচিত ভুলকে সংঘবদ্ধভাবে আঁকড়ে না ধরে সমাধানের লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতেই লেখা হয়েছে বইটি।

৯. আপনার কাছে কি কোনো উত্তম সমাধান আছে?

প্রকৃত ইসলামি ব্যাংক কেমন হবে সেই আলোচনা এই বইতে করা হয়েছে। আপনাদের কাছে যদি আরো ভালো কোনো সমাধান থাকে, তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চেষ্টা করা উচিত। যেকোনো সমাধান অর্জনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে সচেতনতা সৃষ্টি। হয়তো একদিনের সমাধান আমি দেইনি। একটি দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার স্বপ্ন দেখিয়েছি। যেই পশ্চিমা ব্যাংকিং সিস্টেম ৬০০ বছর ধরে শিকড় গেড়েছে এক দিনে তা সমূলে উৎপাটন করা যাবে না। তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকাও যায় না। আমাদের ভালো কাজে অগ্রবর্তী হতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেও বইটি লেখা হয়েছে।

১০. বইটি কি ইসলামের শত্রুদেরকে শক্তিশালী করবে?

বইটি ইসলামের শত্রুদেরকে শক্তিশালী করতে পারে এমন মন্তব্যের সাথে তীব্র দ্বিমত পোষণ করছি আমি। ইসলাম এবং ইসলামি ব্যাংক এই দুটি এক না। ইনশাল্লাহ, বইটি মিথ্যার মায়াজাল ছিন্ন করবে এবং সমাধানগুলোও একদিন বাস্তবায়িত হবে। এর সবই মুসলিম সমাজকে শক্তিশালী করবে এবং ইসলামের শত্রুদের গাত্রদাহের কারণ হবে।

১১. এই বইটি ে

পেছনে কে

? লেখার

প্রচলিত

করেছে?

কা

কে আমি খুব

রাষ্ট্রের অর্থনীতি,

রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে

বাইরে নয়। পশ্চিমা

ভিন্ন ধর্ম সুদকে খারাপ

মেনে নিয়েছে। এক

জালের বিরুদ্ধে ইসলাম

বশিষ্ট নেই। না ধর্মের জগতে

ও অর্থনীতির ছাত্র, প্রথমে সুদের

ষণাধর্মী কাজ করার সিদ্ধান্ত নিই।

করি যে সুদ কেবল মুসলিমদের জন্য

। ধর্ম, জাতি এবং কালের মানুষের জন্য

ব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য' বইটিতে

র্ণ অর্থনৈতিকভাবেই প্রমাণ করা হয়েছে।

বইটি । কাজ করতে গিয়ে একটি বিষয় আমার চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। প্রচলিত ব্যাংক যেভাবে মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরিকল্পিতভাবে দেউলিয়াত্ব সৃষ্টি করে জনগণের সম্পত্তি গ্রাস করে– ইসলামি ব্যাংকিং ঠিক একই কাজ করে। সব মিলিয়ে অর্থনৈতিকভাবে প্রচলিত ব্যাংকের সাথে ইসলামি ব্যাংকের কোনো তফাত নেই।

এই বিষয়টি আমার কাছে খটকা লাগল। তাই ইসলামি ব্যাংকের ব্যাপারে আরো ভালো করে জানতে পড়াশোনা করি এবং এর পক্ষের ও বিরুদ্ধের উভয় পক্ষের মতামতই শুনি। তখন আমার কাছে আরো স্পষ্টরূপে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়ে উঠল যে, ইসলামি ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংক প্রায় একই (সামান্য কিছু প্রক্রিয়াগত পার্থক্য ছাড়া)।

এই ব্যাপারে যখন পাবলিক স্ফিয়ারে আলোচনা তুলি অনেকেই পরামর্শ দেন ইসলামি ব্যাংকের শরিয়া বোর্ডের সাথে কথা বলতে। তাই বিভিন্ন ব্যাংকের শরিয়া বোর্ড এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে ধীরে ধীরে আলোচনা করি। শরিয়া বোর্ডের ব্যক্তিরাও স্বীকার করেন যে প্রচলিত ব্যাংক এবং ইসলামি ব্যাংকের প্রভাব মানুষের জীবনে বা অর্থনীতিতে খুব একটা ভিন্ন না। তাহলে কেন একটি হালাল হবে এবং একটি হারাম হবে? এমন প্রশ্নের জবাবে তারা একটিকে ব্যবসা (বাহানা) এবং আরেকটিকে সুদ হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। তখন আমি প্রশ্ন ছুড়ে দেই, যেই ব্যক্তি (সুদ গ্রহণকারী) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে (সূরা বাকারা) এবং যেই ব্যক্তি (সৎ ব্যবসায়ী) নবি রাসূল, শহিদ ও সিদ্দিকদের সাথে থাকবে (তিরমিজি, হাদিস ১২০৯) তাদের মাঝে পার্থক্য কেবল এতটুকুই (ব্যবসার নামে সাজানো নাটক)? এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আমি পাইনি।

তাই ইসলামি ব্যাংক কিভাবে কাজ করে এবং এই সিস্টেমের মহাগলদটা কী তা নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী একটি লেখা লিখে 'সুদ হারাম, কর্জে হাসানা (একটি) সমাধান' বইতে অন্তর্ভুক্ত করে দিই। কিন্তু বইটির মূল লেখার সাথে যায় না বলে (প্রকাশনীর পরামর্শে) তা ফেলে দিতে হয়।

এই জগতে কাজ করতে গিয়ে আমি একটি বিষয় দেখেছি যে, ইসলামি ব্যাংকের ব্যাপারে কথা বলতে অনেকেই ভয় পায়। আরেকটি বিষয় আরো প্রকটভাবে দেখেছি যে বেশিরভাগ মুসলিম কিছু না জেনেই ইসলামি ব্যাংককে বিশ্বাস করে। তাই কিভাবে মানুষকে জানানো যায় এবং সত্য উন্মোচন করা যায় সেই চিন্তা থেকে একটি বই লেখার স্বপ্ন দেখি। তবে কিছু বাধা ও ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে সেই পরিকল্পনা নিয়ে আর সামনে আগানো হয় না। এভাবে দিন যেতে যেতে সেই পুরনো স্বপ্ন ফিকে হয়ে আসতে থাকে

এবং এক পর্যায়ে হারিয়ে যেতে থাকে; এমন সময় একদিন হঠাৎ করেই রিদ্মিক ল্যাব আমার সাথে যোগাযোগ করে। তারা জানাল আমাদেরকে কি একটি নতুন ই-বই দিতে পারবেন? আমি সাথে সাথেই না করে দিতে যাচ্ছিলাম; এমন সময় তারা জানাল, 'কোনো পেইজ লিমিট নেই।'

কথাটা শুনে আমার মনে পড়ল ১৫ পেইজের যেই লেখাটি 'সুদ হারাম, কর্জে হাসানা সমাধান' বই থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল তা একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আকারে হাজির করা যায়। একটু ভয়ে ভয়েই আমি বললাম, "একটি জ্বালাময়ী লেখা আছে– ইসলামি ব্যাংকগুলোর শুভংকরের ফাঁকি। মাত্র ১৫ পেইজের। নেবেন?" তারা আমার কথা শুনে সম্মতি জানায়। তখন ভাবলাম ১৫ পেইজ কেন? লিখব যখন, ভালো করেই লিখি। তাই কাজটি নিয়ে পুরোদমে লেগে পড়ি।

এখন আমার মনে হয় এই সবকিছু আল্লাহরই পরিকল্পনা ছিল। কারণ, লেখালেখি করার স্বপ্ন আমি কোনদিন দেখি নাই। আমার স্বপ্ন ছিল বড় একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করব, হয়তো পশ্চিমা কোনো এক দেশে। সেখানে বসে নিশ্চিন্তে দিন কাটাব, কত নতুন নতুন মানুষের সাথে মিশব ইত্যাদি। কিন্তু আজ আমি একটি ছোটখাটো চাকরি নিয়েই সন্তুষ্ট আছি এবং তাও ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে লেখালেখির জন্য। এত পরিবর্তন কিভাবে হলো?

এর কোনো জাগতিক ব্যাখ্যা নেই। আল্লাহ আমার মতো পাপী বান্দাকে যে মানুষের সামনে সত্যকে উন্মোচন করার জন্য বাছাই করেছেন তার জন্য তার দরবারে হাজারো ধন্যবাদ। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যেন সঠিক রাস্তায় থাকতে পারি এবং গুনাহ থেকে মাফ পেতে পারি এই দোয়াই করি। এই কাজটিতে যারা সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ না করলে গল্পটা অপূর্ণ রয়ে যায়। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।

প্রয়োজনীয় শব্দ ও ব্যাখ্যা

নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট ও ভস্ট্রো অ্যাকাউন্ট

একটি ব্যাংক (ক) যখন অপর কোন ব্যাংকে (খ) বৈদেশিক মুদ্রা ডিপোজিট রাখে তখন সেই ডিপোজিট অ্যাকাউন্টকে প্রথম ব্যাংকের (ক) নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট বলে। দ্বিতীয় ব্যাংকের (খ) জন্য তা ভস্ট্রো অ্যাকাউন্ট। অর্থাৎ, আপনার ব্যাংকে যদি অন্য কোন ব্যাংক বিদেশি মুদ্রা রাখে তাহলে তা আপনার ব্যাংকের জন্য ভস্ট্রো অ্যাকাউন্ট।

উদাহরণ– শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক আমেরিকার জেপি মরগ্যানে কিছু ডলার সঞ্চিত রাখলো। তাহলে শাহজালাল ব্যাংকের এমডি পাপন বলবে, "জেপি মরগ্যানে আমার নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট আছে।" আবার জেপি মরগ্যানের এমডি ডোনাল্ড বলবে, "আমাদের ব্যাংকে শাহজালাল ব্যাংকের ভস্ট্রো অ্যাকাউন্ট আছে।"

জাকাত

একজন মুসলিম ব্যক্তির হাতে যেই পরিমাণ চলতি সম্পদ এক চন্দ্র বছর পর্যন্ত স্থায়ীভাবে থাকে (ঋণ বাদে), তার ৪০ ভাগের এক ভাগ অভাবী ও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের দান করতে হয়। একেই জাকাত বলে। সকল প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নর-নারীর জাকাত প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য।

আখুওয়াদ

আখুওয়াদ পাকিস্তানের একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম। এই প্রতিষ্ঠানটি সুদমুক্ত উপায়ে মাইক্রো ক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণ লেনদেন করে থাকে।

শরই

শরিয়া শব্দটির বিশেষণ হচ্ছে শরই। যেমন শরই সম্পাদনা, শরই বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

আওফি

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution-কে সংক্ষেপে আওফি বলে। বিশ্বব্যাপী দ্রুত বর্ধনশীল ইসলামি ফাইনান্স শিল্পকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালে আওফি (AAOIFI) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর সদর দপ্তর বাহরাইনের মানামা শহরে অবস্থিত।

ডিপোজিট

ব্যাংকে টাকা রাখাকে ডিপোজিট করা বলে। মনে করুন, আপনি যমুনা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে মাসের প্রথমে ৫০ হাজার টাকা ডিপোজিট করলেন, তাহলে আপনার একাউন্টে ৫০ হাজার টাকা যোগ করা হবে। আবার আপনি যদি অ্যাকাউন্ট থেকে ৩০ হাজার টাকা তুলে ব্যয় করেন, তাহলে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে ৩০ হাজার টাকা বিয়োগ করা হবে। তাহলে আপনার মোট ডিপোজিট হবে ২০ হাজার টাকা। সহজ বাংলায় ডিপোজিট শব্দের অর্থ হচ্ছে জমা।

মুরাবাহা

মুরাবাহা এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। এই চুক্তিতে একজন ক্রেতা যখন বিক্রেতার থেকে পণ্য কিনেন তখন তিনি (ক্রেতা) পণ্যের ক্রয়মূল্য এবং আনুষঙ্গিক খরচের সমান টাকা পরিশোধ করেন।

উদাহরণ– মনে করুন আমি চীন থেকে একটি খেলনা কিনব। সেই খেলনার দাম ৫০০ টাকা। কিন্তু আমি চীনে থাকি না। আপনি আমাকে বললেন, "আমার পরিচিত একজন লোক আছে যিনি চীনে থাকেন। আমি তাকে দিয়ে আপনার জন্য চীন থেকে খেলনাটা আনিয়ে দিব। আপনি আমাকে ১০০ টাকা বাড়তি দিয়েন।"

অর্থাৎ, ৬০০ টাকা দিয়ে আমি খেলনাটা কিনতে পারব। ৫০০ টাকা হচ্ছে খেলনার দাম এবং ১০০ টাকা হচ্ছে খরচ।

আবার মনে করুন, রংপুরে একটি গরুর দাম ১ লক্ষ টাকা। আপনি আমার জন্য রংপুর থেকে শেরপুরে গরুটি এনে দিবেন ১০ হাজার টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। এই চুক্তিও মুরাবাহা।

এই ধরনের চুক্তি সম্পূর্ণ বৈধ এবং ন্যায্য। কিন্তু কেউ যদি কাজের ছুতো ধরে খরচ বাবদ মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে তাহলে চুক্তিটি ন্যায্যতা হারিয়ে ফেলবে। যেমন কোনো ব্যক্তি বাজারে আপনার সামনে ১ লক্ষ টাকায় একটি গরু কিনে সাথে সাথেই যদি আপনার হাতে গরু তুলে দিয়ে বলে এর দাম ২ লক্ষ টাকা (১ লক্ষ টাকা প্রকৃত দাম এবং ১ লক্ষ টাকা খরচ), তাহলে আপনি নিশ্চয়ই মেনে নিবেন না। কারণ এই ক্ষেত্রে কোনো পরিশ্রম ছাড়াই অন্যায্য পারিশ্রমিক দাবি করা হয়েছে।

বায়-মুয়াজ্জাল

বায়-মুয়াজ্জাল হচ্ছে বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করা, ইংরেজিতে যাকে বলে Credit Sale/Purchase। কোন পণ্য বা সেবা আপনি যদি নগদে ক্রয়-বিক্রয় না করে বাকিতে করেন তাকে বায়-মুয়াজ্জাল বলে।

উদাহরণ– আমি আপনার থেকে এক মাসের চাল কিনে বললাম সামনের মাসে বেতন পেলে দাম দিয়ে দিব। এটা বায়-মুয়াজ্জাল। এই চুক্তি অনুযায়ী আপনি যেই সময় পণ্য কিনেছেন দাম সেই সময়ে স্থির থাকে। মনে করুন, আজকের বাজারে চালের দাম ৬০ টাকা কেজি কিন্তু এক মাস পরে তা হয়ে গেল ৭০ টাকা। তখন বিক্রেতা আপনার থেকে বাড়তি দাম আদায় করতে পারবে না, যেই সময়ে চুক্তি হয়েছে সেই সময়ের বাজার মূল্যে দাম স্থির থাকবে। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে টাকা দিতে দেরি করলে বিক্রেতা দাম বাড়াতে পারবে না।

মুদারাবা

মুদারাবা এক ধরনের ব্যবসা বিনিয়োগ ও পরিচালনা চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী একজন পরিচালক লাভের কিয়দাংশ পারিশ্রমিক হিসেবে পান।

উদাহরণ– আপনি যদি আপনার ব্যবসা দেখভালের জন্য একজন লোক নিয়োগ করে বলেন, "ব্যবসা মালিকানা আমার। কিন্তু প্রতি বছর ব্যবসা থেকে যা লাভ আসে তার ২০% আপনি পাবেন। এই ২০% হচ্ছে আপনার পারিশ্রমিক। ব্যবসায় লাভ যত বেশি হতে পারে, আপনার পারিশ্রমিক তত বেশি, যেহেতু মোট লাভের ২০ শতাংশ আপনার। তবে সম্পদের মালিকানা আমার থাকবে যেহেতু আপনি কোনো টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করছেন না।" এই ধরনের চুক্তিকে বলে মুদারাবা।

সাহীব আল মাল ও মুদারিব

মুদারাবা চুক্তিতে যিনি মূলধন প্রদান করেন; অর্থাৎ, যিনি ব্যবসার মালিক তিনি হচ্ছেন সাহিব আল মাল। আর যিনি ব্যবসা পরিচালনা করেন তাকে বলা হয় মুদারিব।

মুশারাকা

আমরা বর্তমানে পার্টনারশিপ ব্যবসা বলতে যা বুঝি তাই হচ্ছে মুশারাকা। একাধিক অংশীদার একত্রে ব্যবসা করলে তার নাম বাংলাতে অংশীদারিত্ব ব্যবসা, ইংরেজিতে পার্টনারশিপ এবং আরবিতে মুশারাকা।

উদাহরণ– সুবর্ণা ও অপর্ণা প্রত্যেকে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে একত্রে ১ লক্ষ টাকার একটি ব্যবসা শুরু করলো। প্রতি বছর ব্যবসায় ২০ হাজার টাকা লাভ আসে। তারা দুই বান্ধবী ৫ হাজার করে মোট ১০ হাজার টাকা নিজেদের জন্য রাখে এবং বাকি টাকা ব্যবসায় পুনরায় বিনিয়োগ করে। কয়েক বছর যাবার পরে

তারা ব্যবসাটি ৪ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দিল। সুবর্ণা নিল ২ লক্ষ টাকা এবং অপর্ণা নিল ২ লক্ষ টাকা। একেই বলে অংশীদারিত্ব ব্যবসা বা মুশারাকা।

ইখতিলাফ

ইখতিলাফ শব্দের অর্থ মতপার্থক্য, অনৈক্য। ইসলামের কোন বিধানের ব্যাপারে যখন একজনের সাথে আরেকজনের মতপার্থক্য হয় তখন তাকে শরিয়তের পরিভাষায় বলে ইখতিলাফ।

হীলা বা বাহানা

হীলা একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ বাহানা, চাতুরী বা ছল। কোন অবৈধ বস্তুকে রং-চং মিশিয়ে হকের মত করে উপস্থাপন করলে যেন দর্শক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে কিংবা এমন কোন বাহানা করলে যেন হকের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাকে শরিয়তের পরিভাষায় হীলা বলে। সহজ বাংলায় কোন বস্তুর মৌলিক উপাদান পরিবর্তন না করে কেবলমাত্র বাহ্যিক আবরণ পরিবর্তন করার নামই হীলা।

হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (এইচ.পি.এস.এম)

এই পদ্ধতিতে ব্যাংক এবং গ্রাহক একসাথে একটি সম্পদ যেমন যন্ত্রপাতি, জাহাজ বা গাড়ি কিনে থাকে। তারপর ব্যাংক এই সম্পদের অংশ গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেয়। গ্রাহক কিস্তিতে ভাড়া + বাড়তি টাকা পরিশোধ করতে থাকে। নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত যেই বাড়তি টাকা গ্রাহক কিস্তিতে পরিশোধ করে তার সমানুপাতে সম্পদের মালিকানা স্থানান্তরিত হতে থাকে। সব কিস্তি পরিশোধের পর সম্পদের সম্পূর্ণ মালিকানা গ্রাহকের হয়ে যায়।

ইজারাহ্ বা লিজিং

এই পদ্ধতিটি হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (এইচ.পি.এস.এম)-এর মতই। তবে এক্ষেত্রে সম্পদের মালিকানায় গ্রাহকের অংশ নাও থাকতে পারে। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে এই মোডে কিস্তি প্রদানের সাথে সাথে মালিকানা স্থানান্তরিত হয় না। গ্রাহক চাইলে মেয়াদ শেষে ব্যাংকের থেকে একটি নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে মালিকানা কিনে নিতে পারে।

দেউলিয়া (Bankrupt)

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন পাওনাদারের ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, তখন উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া বলে। ঋণদাতা কোর্টে কেস করলে দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদ জব্দ করে কোর্ট ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

কর্জে হাসানা

'কর্জ' শব্দের অর্থ ঋণ; আর হাসানা শব্দের অর্থ উত্তম। উভয়ে মিলে কর্জে হাসানা শব্দদ্বয়ের অর্থ দাঁড়ায় 'উত্তম ঋণ'। অতিরিক্ত কোনো কিছু অর্জনের শর্ত ছাড়া কাউকে বিনা সুদে ঋণ দিলে তাকে 'কর্জে হাসানা' বা উত্তম ঋণ বলে। এই লেনদেনে ঋণ-গ্রহীতা যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ নিয়েছে, ঋণ দাতা ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ ফেরত পায়।

পুনঃক্রয় বা বাই ব্যাক বা ইনা

কোন দ্রব্য বাকিতে বিক্রয় করে পুনরায় অল্প মূল্যে কিনে লাভ করাকে পুনঃ ক্রয় বা ইনা বলে। এটি এক প্রকার বাহানা বা হীলা।

উদাহরণ– জামসেদের থেকে আমজাদ এক লক্ষ টাকা ঋণ চাইল। যেহেতু ঋণ দিয়ে লাভ করা হারাম সেহেতু জামসেদ বলল, "নাও, এই সাইকেলটি ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকায় বাকিতে কিন, এক বছর পরে টাকা দিও। আমি এখনই আবার তোমার থেকে সাইকেলটি ১ লক্ষ টাকায় কিনে নিব।" অর্থাৎ, জামসেদ ১ লক্ষ টাকা আজকে ধার দিয়ে এক বছর পরে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ফেরত চাইছে; কিন্তু সরাসরি কাজটা করতে পারছে না দেখে সে বলল, "সাইকেল কিনে নাও। এর দাম ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। কিন্তু এক বছর পরে টাকাটা দিও।" আমজাদ সাইকেল কিনল।

এবার জামসেদ বলল, "সাইকেল বিক্রি কর আমার কাছে। ১ লক্ষ টাকা দিব।"

আমজাদ তাই করে ১ লক্ষ টাকা হাতে বাড়ি ফিরল এবং পরের বছর ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ফেরত দিল। এই ধরনের চুক্তি ইসলামে নিষিদ্ধ যেহেতু এখানে সুদ আদায়ের জন্য বাহানা হচ্ছে।

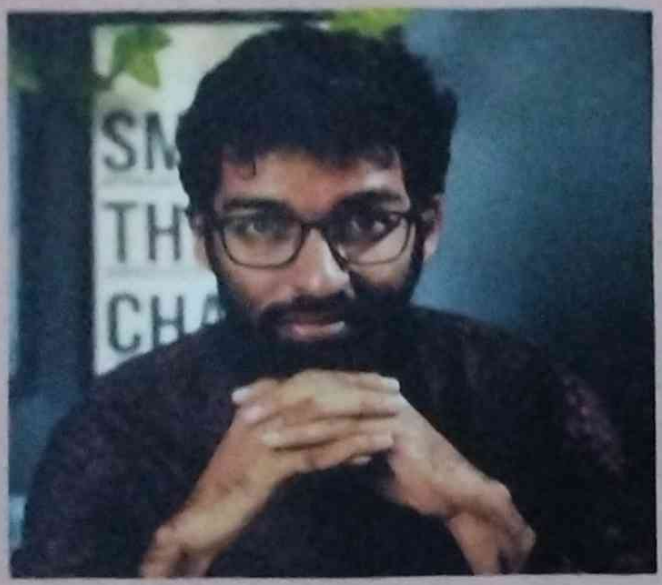

মোহাইমিন পাটোয়ারী বর্তমানে বাংলাদেশের একটি কনসালটেন্সি ফার্মে অর্থনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে কর্মরত আছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে বিবিএ ডিগ্রি সম্পন্ন করে তিনি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'চার্টার্ড ফাইনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট' প্রোগ্রামে যোগ দেন। অর্থনীতি এবং ফাইনান্সের পাশাপাশি গণিতের প্রতিও রয়েছে তার তীব্র ঝোঁক। সিএফএ অধ্যয়নকালেই তিনি উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে দ্বিতীয় স্নাতক প্রোগ্রামের ছাত্র হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। সেখান থেকে ২০১৬ সালে স্নাতক পর্যায়ের গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের সেরা দশে অবস্থান করার পুরস্কার অর্জন করেন। ২০১৭ সালে তিনি সবচেয়ে কম সময়ে (তিন বছরে) সিএফএ ডিগ্রিও সম্পন্ন করেন।

গণিতে স্নাতক সম্পন্ন করার আগেই নরওয়েতে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য তার ডাক পড়ে। পরবর্তীকালে 'নরওয়েজিয়ান স্কুল অব ইকনমিক্স' থেকে দ্বৈত মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য তাকে বৃত্তি প্রদানপূর্বক জার্মানির স্বনামধন্য 'মানহাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে' পাঠানো হয়। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে দুটি মাস্টার্স প্রোগ্রাম শেষ করে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বর্তমানে তিনি সরল বাংলায় সবার জন্য অর্থনীতির বই লিখে যাচ্ছেন। তার প্রকাশিত বই– 'ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য' এবং 'সুদ হারাম কর্জে হাসানা সমাধান' ইতোমধ্যেই বেস্টসেলার খেতাব অর্জন করেছে।

পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, ভ্রমণ, এবং ভাষা শিক্ষার জগতেও তিনি একজন সক্রিয় ব্যক্তিত্ব। ২০১৮ সালে চাইনিজ ব্রিজ কম্পিটিশনে জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় স্থানসহ খেলাধুলার জগতে রয়েছে তার একাধিক পুরস্কার। বই লেখার পাশাপাশি সংবাদপত্রেও তিনি কলাম লিখেন। তার সরল ভাষায় এবং গল্পের ভঙ্গিমায় লেখাগুলো ইতোমধ্যেই পাঠকদের মন কেড়েছে।